প্রাক্তনী সংযোগ

In This Issue...

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে...	1
NEW BEGINNINGS	2
সভাপতির শুভেচ্ছাবার্তা	2
গাবেসু সম্পাদকের কলমে নববর্ষ – ১৪৩১	2
HONORING THE LEGACY OF SRIPATI BHATTACHARYYA: A BEACON OF PHILANTHROPY	3
CELEBRATING A DECADE OF EXCELLENCE: GAABESU ALUMNI RESEARCH AWARD PROGRAM	4
ICONIC CLOCK - STARTED TICK-TOCKING AGAIN	5
BREAKING NEWS FROM THE VIBRANT PUNE CHAPTER!	6
BIJAYA SOMMELONI 2023 AND ANNUAL PICNIC 2024:A REPORT FROM BECAA,MAHARASHTRA	6
CELEBRATING CAMARADERIE: A NIGHT TO REMEMBER FOR BEC/IIEST SHIBPUR ALUMNI	8
A REPORT FROM SAN FRANCISCO BAY AREA	8
SUCCESS STORY OF ABHROKANTI SAHA, 2015 CE	9
SUCCESS STORY OF SUBRATA BISWAS , 2011-IT	12
SUCCESS STORY OF ARUP DASH , 1998 ETC	13
রবীন্দ্রসূত্রে শান্তিনিকেতনের বিদেশী অতিথি-অধ্যাপক	15
জঙ্গলের অনুশাসন	19
দুর্গাপুজো আমেরিকান কায়দায়	22
বাংলা নববর্ষ	23
কবিতাগুচ্ছ	26
শরাহত পারাবতের সুর : প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালের ক্ষুব্ধ কবিকণ্ঠ	27
টেনিসের সেকাল ও একাল	31
নতুন বছর এলে	33
হাত ধরবে	34
গল্পবাসা-ঘুষ	35
ON THE CANVAS	38
SHUTTER BUG	40
CLASS OF 1998 RELIVE THEIR 25 YEARS	41

Alumni Link | Editorial Team

Manoj Kar | 1980 ETC

Sandeep Chatterjee | 1998 ME

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে...

Manoj Kar | 1980 ETC

‘বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে

ঝরে রোদ , বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন ।

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে

উদার গৈরিক মাঠে , খোলা পথে ,

উত্তাল নদীর বাঁকে বাঁকে , নদীও নর্তকী হয়।‘

- **কবি শামসুর রহমান।**

অ্যালামনি লিঙ্ক –অ্যালামনি ডে সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর তিনমাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ইংরেজি নববর্ষ থেকে এসে গেল বাংলা নববর্ষ। সেই সঙ্গে পেরিয়ে এলাম ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারি- বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস। বাংলা নববর্ষ, ভাষা দিবস এবং আসন্ন রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তীকে স্মরণে রেখে নববর্ষ সংখ্যায় আমরা বাংলা লেখাকে প্রাধান্য দিয়েছি। আমাদের এই আন্তরিক প্রয়াসকে যে সমস্ত প্রাক্তনীরা বাংলা গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ পাঠিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

একথা আমরা সবাই জানি যে বাংলা ভাষা,সাহিত্য এবং সংস্কৃতি আজ এক সঙ্কটের মুখোমুখি। অনেকে যুক্তি দিয়ে থাকেন যে বিশ্বায়নের যুগে প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার কোনও ভূমিকা নেই। সুতরাং বাংলা ভাষার চর্চা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজি ভাষা প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের কাছে অন্যতম স্বীকৃত ভাষা। তবুও সমগ্র বিশ্বজুড়ে মাতৃভাষা সমাদৃত। নিজের দেশ, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সমাজকে জানতে গেলে পেশাগত শিক্ষার পাশাপাশি নিজের মাতৃভাষার চর্চা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের রত্নভান্ডারের হদিস না পেলে পেশাগতভাবে আমরা যতই ধনী হইয়ে উঠি না কেন জীবন এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আমরা হতদরিদ্র হয়েই থাকবো। আমরা সবাই জানি বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সমুদ্রে অবগাহন করে সেই বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধানে ব্যপৃত হয়েছে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। আমরা নিজেরা যদি আমাদের এই ঐশ্বর্যশালী মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা ও অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখি তবে প্রকৃতই হতভাগ্য আমরা।

একথা ভুললে চলবে না যে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙালিরা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আজ তা দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসঙ্ঘের সদস্যদেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। ‘আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’কে যদি আমরা সত্যিই ভুলতে না চাই তবে আসুন এই প্রজন্ম এবং পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যচর্চায় আগ্রহী করে তুলি।

‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা !
মাগো তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা !
কি যাদু বাংলা গানে- গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল- গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা !’

- **কবি অতুলপ্রসাদ সেন।**

সকলকে জানাই বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

Editorial

NEW BEGINNINGS

Sandeep Chatterjee | 1998 ME

The history of Poila Boishakh dates back to the Mughal era in the 16th century when the emperor Akbar introduced a new system of taxation based on the harvest season. This coincided with the Bengali New Year, which had been traditionally celebrated by the local population. He introduced the Mughal calendar, which was a combination of Islamic and Hindu calendars. Akbar’s decision to align the fiscal year with the Bengali calendar made the festival an official event in the Mughal court.

The significance of Poila Boishakh extends beyond just a New Year celebration. It is a time for renewal and fresh beginnings, and it represents the spirit of unity and togetherness among the Bengali community. The festival is a testament to the rich cultural heritage of the Bengali people and their deep connection to their roots.

But over the years, this festival is a day of celebration but nothing beyond that. It is a time to introspect, forget all worries and move forward in life. Easier said than done but it has to start somewhere. We have not been doing well as an institution and it is time to pull up our socks if we intend to reach our old glory.

The Alumni has been instrumental in leading this pathway with creating multiple forums for the students, professors to interact with alumni. There have been quite a few notable webinars for the benefit of the greater community. But the state of infrastructure remains dismal which is a cause of concern.

We are pleased to bring out the Poila Boishakh edition of the Alumni Link in digital format. Do share your views to help us do better.

As Oprah Winfrey said , ““Cheers to a new year and another chance for us to get it right.”

সভাপতির শুভেচ্ছাবার্তা

Amitabha Dutta | 1974 CE

বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। এই মাসটা বাঙালির কাছে এক বিশেষ মাস, যেটাকে আমরা বলে থাকি রবীর মাস। এই বৈশাখের ২৫ তারিখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।

এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে এই নববর্ষ উপলক্ষে গাবেসু তাদের পত্রিকা,‘এ্যালামনি লিঙ্ক’ এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে চলেছে।

আমরা সকলেই আশা করে থাকি এই পারিবারিক পত্রিকার জন্য, যেটা আমাদের সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কে তাদের বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে একত্র হওয়ার দিশা দেখায়।

এই নববর্ষ সংখ্যার জন্য আমার তরফ থেকে প্রানঢালা শুভেচ্ছা রইলো।

আশা করবো এই পত্রিকাটিকে আপনারা সকলে বিভিন্ন রকমের লেখা ইত্যাদি দিয়ে আরও সুন্দর ও প্রাণোজ্জ্বল করে তুলতে সাহায্য করবেন।

গাবেসু সম্পাদকের কলমে নববর্ষ - ১৪৩১

Prosenjit Chakraborty | 1987 EE

আমাদের পুরানো বাংলা বছরটা শেষ হয়ে এল ।
১৪৩০ পার হয়ে ১৪৩১ দুয়ারে কড়া নাড়ছে । যদিও গত বেশ কিছু বছর, বাংলা নতুন বছরের সাথে আমাদের সম্পর্ক টা অনেকটাই আলগা হয়ে এসেছে, তবুও কিছুএকটা যোগসুত্র এখোনো রয়েই গেছে। আমাদের ভেতরকার বাঙ্গালীয়ানাটাকে এখনো আমরা পুরোপুরি গুলিয়ে দিয়ে উঠতে পারিনি। চৈত্র – বৈশাখের বিকেলে কালবৈশাখি ঝড়, পশ্চিম আকাশ জুড়ে ঘন কালোমেঘ, মাঠ থেকে খেলা ছেড়ে বাড়ির দিকে দৌড়, রাস্তায় স্তুপ হয়ে পড়ে থাকা অজস্র ঝরা পাতা আর

কৃষ্ণচূড়া ,গাছে পলাশ আর শিমুল, এই ছবিটা এখোনো ভুলতে পারিনি। আবার পয়লা বৈশাখ হালখাতা'র দিন বিকেলে দোকানে দোকানে ঘুরে মিষ্টির প্যাকেট আর বাংলা ক্যালেন্ডার তুলে নিয়ে আসা। এগুলো সবই আজকাল ছবিতে দেখা যায় ।

এই সময়েই বেরতে চলেছে আমাদের বি ই কলেজের প্রাক্তনী দের পত্রিকা "অ্যালামনি লিঙ্ক" এর নববর্ষ সংখ্যা । গত বেশ কয়েক বছরের জড়তা ঝেড়ে ফেলে আমরা গত বছর পুজো'র সময় থেকে আবার নিয়মিত "অ্যালামনি লিঙ্ক" প্রকাশ করতে শুরু করেছি।

তবে শুধুমাত্র ডিসেম্বর এর "অ্যালামনি ডে" উপলক্ষ করে যে সংখ্যাটা প্রকাশ করা হচ্ছে সেটা হবে কাগজে ছাপা, আর বছরে বাকি তিনটে শুধুই অনলাইন , ই-পত্রিকা। সেই হিসাবে এটা দ্বিতীয়। আরেকটা সংখ্যা, ইচ্ছে আছে, বর্ষার সময়ে , জুলাই – আগস্টে , বেরোবে।

গত ডিসেম্বর এ সফলভাবে "অ্যালামনি ডে" অনুষ্ঠান করার পরে, এই মার্চ মাসে আমাদের বাৎসরিক "Scholarship, AFE and Research Award" দেওয়ার অনুষ্ঠান ও আমরা সফলভাবে অনুষ্ঠিত করেছি । এইবছরে আমরা মোট ১৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী কে তেইশ লাখ টাকা'র ও বেশী অনুদান দিয়ে সাহায্য করতে পেরেছি, এবং এর সবটাই অ্যালামনিদের দান থেকে করা। আমাদের বি ই কলেজের সঙ্গে প্রাক্তনী দের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে খুব একটা বলার কিছু নেই । আমরা সবাই এখানকার ছাত্রছাত্রী হিসেবে গর্বিত ,আমরা আমাদের শিক্ষকদের নিয়ে গর্বিত । আমরা সবাই এই ক্যাম্পাসে কাটান চার/পাঁচ বছর নিয়ে গর্বিত । ঐ সময়ে যেটুকু আমরা অর্জন করেছি , সেটাই আমাদের বাকি জীবনে পথচলার পাথেয় । এখন পালা আমাদের সাধ্যমত ফেরত দেওয়ার, আর সেই চেষ্টাই আমরা করে চলেছি, আমাদের এই গাবেসু কে মাধ্যম করে। আমরা চাই, আমরা চেষ্টা করছি, আরো বেশী করে বর্তমান ছাত্রদের, আর না-অতি প্রাক্তনদের কাছে টেনে আনতে, তাদের ও এই কাজের মধ্যে মিলিয়ে নিতে, যাতে ভবিষ্যতে তারাই দায়িত্ব নিয়ে এই সংগঠন কে এগিয়ে নিয়ে চলে।

Honoring the Legacy of Sripati Bhattacharyya: A Beacon of Philanthropy

Swapan Saha | 1988 EE

In a heartwarming tribute to the late Sripati Bhattacharyya whose life exemplified dedication to both education and philanthropy, his family has established a recurring GAABESU scholarship for the Electrical Engineering department at IIEST Shibpur in March 2024. Mr. Bhattacharyya, an alumnus of B.E College's Electrical Engineering program, graduated in 1963 and embarked on a remarkable journey that spanned continents and industries.

.

After completing his undergraduate studies, Mr. Bhattacharyya began his professional career in Kolkata before pursuing further education in England, where he earned his M.S. degree in Control System Engineering from Salford University. His career took him to the United States, where he worked with notable companies such as Stone & Webster in New York and Commonwealth Corp in Jackson, Michigan, ultimately settling in the San Francisco Bay Area. Throughout his career, he made significant contributions to the fields of Nuclear Power Industries and Waste Water Treatment, leaving an indelible mark on each.

Despite his professional success, Mr. Bhattacharyya remained grounded in his roots and dedicated to helping the underprivileged. As the Founding Chairperson of the BE College USA Scholarship Fund, he tirelessly worked to support students from his alma mater. His commitment to giving back was unwavering, as he organized annual alumni gatherings and spearheaded efforts to modernize donation methods, ensuring the sustainability and growth of the Scholarship Fund.

In a poignant gesture to honor his eldest brother, also an Electrical Engineering graduate and faculty member of B.E College, Mr. Bhattacharyya established the Bisnupada Bhattacharyya memorial

scholarship. This scholarship stands as a testament to the family's enduring commitment to supporting the educational aspirations of deserving students.

As we reflect on the remarkable life of Sripati Bhattacharyya, we are reminded of the profound impact one individual can have through their dedication to education and philanthropy. The scholarship established in his name will serve as a lasting tribute to his legacy, ensuring that future generations of students at B.E College have the opportunity to pursue their dreams and make a difference in the world.

The Bhattacharyya family's commitment to continuing Mr. Bhattacharyya's charitable tradition is a testament to their unwavering belief in the power of education to transform lives. Through their generosity, they are ensuring that his vision of supporting brilliant students' lives on, leaving an enduring legacy of hope and opportunity for generations to come.

Celebrating a Decade of Excellence: GAABESU Alumni Research Award Program

Nihar Biswas| 1970 CE

A Decade of Nurturing Academic Leaders

In the pursuit of fostering the next generation of academic leaders, the GAABESU Alumni Research Award stands as a testament to the commitment of the Global Alumni Association of Bengal Engineering and Science University (GAABESU). This prestigious annual award, marking its 10th anniversary in the academic year 2023-24, recognizes the outstanding research efforts of current IIEST (Indian Institutes of Engineering Science and Technology) undergraduate and graduate students who are actively engaged in research alongside their academic studies.

Welcoming New Perspectives: Alumni in the Committee

One of the significant updates in the GAABESU Research Award Program involves the induction of three distinguished alumni into the Research Award sub-committee. These alumni, hailing from various corners of the globe, bring diverse perspectives and expertise to the committee:

- Prof. Tarun Podder (88 ME), USA
- Prof. Sudipta De (89 ME), India
- Prof. Ashirbani Saha (2006 ETC), Canada

Their inclusion, along with the continued participation of existing committee members, ensures a rich blend of experience and fresh ideas in the evaluation process:

- Prof. Nihar Biswas (70 CE), Canada
- Dr. Gautam Chattopadhyay (87 ETC), USA
- Prof. Partha Pratim Chattopadhyay (84 MET), India

Enhancing Skills and Expanding Horizons

All candidates, following their application for the individual Research Awards, were required to present their research activities online to the global alumni community. Here, they were evaluated both for their presentation skills as well as their knowledge of the subject matter. Prior to this event, to assist our students to further enhance their skills, the Research Award Program hosted a workshop focusing on their presentation skills for delivering scientific talks.

Generosity Amplifying Impact: Class of 1988's Donation

A heartening development in the program is the generous donation of INR 10 lakhs by the Class of 1988. This donation has increased the number of Research Awards from 8 to 10, reflecting the alumni community's commitment to supporting and recognizing academic excellence.

Recognizing Excellence: GAABESU Research Award Winners

2023-24

After meticulous review and evaluation, the committee was impressed by the remarkable achievements of the IIEST students. The following students emerged as the proud recipients of the GAABESU Research Awards for the academic year 2023-24:

- Anuvab Sen (ETC 4th) - 1988 Batch Research Award I
- Suvam Dey (ETC 4th) - Ashok Kumar Sarkar Memorial Research Award I
- Mayukhi Paul (IT 3rd) - 1988 Batch Research Award II
- Anuska Roy (CST 4th) - Ashok Kumar Sarkar Memorial Research Award II
- Satota Mandal (IT 3rd) - Ashok Kumar Sarkar Memorial Research Award III

- Toppana Sai Snehal Kumar (ME 4th) - 1965 Mechanical Batch Research Award
- Poorva Mondal (ME 4th) - Madhusudan Bhattacharya Memorial Research Award
- Bhaswati Sen (CE 4th) - Sailendra Kumar Sen and Indira Sen Memorial Research Award
- Abhisek Rajput (ME 4th) - Nripendra Prasanna Acharya Research Award
- Prerona Saha (MET 4th) - Gouri and Jitendra Mazumder Memorial Research Award

Each awardee will receive a grant of INR 25,000.00, generously donated by alumni and supporters dedicated to fostering research excellence at IIEST.

As we celebrate a decade of the GAABESU Alumni Research Award Program, we look forward to witnessing the continued impact of these awards in shaping the future of academic leaders in engineering and science.

Iconic Clock - Started Tick-Tocking Again

Source: https://www.linkedin.com/posts/iiests_iconic-clock-started-tick-tocking-again-activity-7168666271603965954-2hsX/

The century-old iconic and legendary clock tower of 175 years old campus of IIEST, Shibpur has started tick-tocking again after a long non-operational period. A mechanical clock of this size and precision requires regular attention regarding up-keeping and fine adjustment. A team consisting of Prof. Subhas Chandra Mondal (Professor and Head), Dr. Apurba Das (Assistant Professor), and Dr. Rajib Chakraborty (Assistant Professor) from the Mechanical Engineering Department came forward to take up this challenge of bringing the prestigious clock tower on track under the direction of honorable director Prof. Parthasarathi Chakrabarti and ultimately able to get the clock tower on track from mid-February onwards.

Looking back at history, Sir R N Mookerjee, a distinguished alumnus of this college (1883 Civil Engg. Batch), had presented this turret clock to his alma mater, and it was installed at a five-story high tower. The clock was made by Gillett and Johnston, Croydon, England in 1919. The only other Gillett and Johnston clock in the city is the one at the clock tower of New Market, Kolkata.

The IIEST clock tower can be considered one of the engineering marvels in its category and a priceless piece of mechanical engineering equipment. Its uniqueness lies in its escapement wheel that makes it possible for the movements to work with the high-precision spur gear, bevel gear, Paul-ratchet, and cam mechanism. It needs exact synchronization among its 120 gigantic parts to function properly and run in exact time. The giant clock on the campus has a massive bell, manually operated movements with gravity loading, an Invar pendulum four faces complete with clock gradations, and arms in the four directions.

The operating mechanism kept exactly the same as it was installed over 100 years ago to keep it moving. The division wheel, division pulling that pulled the rope to run the pendulum, cams, bushes, and pivots are all restored to their original condition through careful and precise adjustment. As a positive outcome of the whole effort, the clock started operating again, showing the time restlessly from mid-February 2024.

It was not easy to reach the gigantic movements, and faculties had to scale rickety ladders on a steep incline to reach the top of the tower for inspection and fixing the problem. The only manufacturer, Croydon-based British company Gillett and Johnston has now closed for over 65 years. Therefore, support for adjustment and maintenance from the original manufacturer is also restricted. Under these circumstances, the team from Mechanical Engineering Department will look after the upkeep and maintenance of the clock tower henceforth.

Breaking News from the Vibrant Pune Chapter!

Partha Sarathi Banik | 1989 EE

General Secretary-BECAA,Pune Chapter

Our Pune Chapter organized an evening get-together at Sundown Lounge, Boat Club Pune on 17th February, 2024 to welcome the beautiful spring of Pune. In a dazzling display of alumni spirit, the event was a soaring success! With music that got toes tapping and dance moves that defied gravity, the evening was an absolute blast for members and their families alike.

Amidst the swirl of laughter and rhythm, our alumni proved that age is just a number as they grooved alongside their younger counterparts. Dadas, who passed out in early seventies, shared the evening with laughter, shared stories, and a spark of nostalgia with the young guys, who are even younger than their sons. The dance floor witnessed moves that could rival any disco era, with some dance steps even rumored to have originated from textbooks!

As the night unfolded, it became clear that our alumni community knows how to boogie down like nobody's business. From funky beats to sentimental melodies, every song played was a trip down memory lane, sprinkled with a healthy dose of humor and heart.

The event was indeed a celebration of joy, connection, and a few questionable dance moves that will undoubtedly be remembered fondly for years to come. Here's to keeping the rhythm of our alumni community alive and kicking, one funky beat at a time!

Bijaya Sommeloni 2023 and Annual Picnic 2024:A Report from BECAA,Maharashtra

Anjana Ganguly Roy | 1977 ETC

Bijaya Sommeloni 2023:

After Durga puja 2023, BECAA Maharashtra had arranged its Bijaya Sonmeloni (family get together after Durga Puja) on the evening of 15th October, 2023, Sunday in the Banquet Hall of Rustomjee Urbania, Thane.

The get together was successfully attended by more than 100 members and their families. It was an evening filled with chit chat, laughter, songs (performed by members and their families and external artists) and lots of impromptu dances. While all these are happening at one side of the hall, the attendees were served with little refreshments. then evening was ended with sumptuous dinner served at the venue. The programme started at 7 pm and continued till 11 pm.

Annual Picnic 2024:

BECAA, Maharashtra normally welcomes new year through a picnic. And this year, Picnic was scheduled on 14th January, Sunday and venue was selected at Pinewood Resort, Karjat which is around 2 hours drive from Mumbai. BECAA had arranged 3 busses for commuting from various parts of Mumbai to the venue, however, lots of members preferred to take their

own vehicle to reach there. We were around 110 members and their families in the picnic.

Though in the bus, tea and snacks were served, after reaching at the venue, the breakfast was served immediately. Being a Poush Sankranti day, the main attraction was indeed "pati shapta".

We had lots of option to play (cricket, football were played), swimming and the members were utilised them all. At the same time, lots of us spent the time in chitchat, singing, in individual performances. Good food (after breakfast, it was followed by lunch and afternoon tea) and good time spent was the motto of a picnic and we had them all. Before leaving, we had contributed some money to TATA Memorial Cancer Hospital for needy young cancer patients as a part of our regular philanthropic activities.

UPCOMING EVENT

GLOBAL ALUMNI DAY 2024

DATE:

DECEMBER 29, 2024 Sunday

Celebrating Camaraderie: A Night to Remember for BEC/IIEST Shibpur Alumni

A Report from San Francisco Bay Area

Swapan Saha | 1988 EE

San Francisco Bay Area, April 7, 2024 gathering of BEC/IIEST Shibpur alumni proved to be an unforgettable evening, replete

with laughter, cherished memories, and the joy of reconnecting with old friends. Held amidst a backdrop of delightful cuisines and refreshing beverages, the event brought together alumni from various graduating classes, spanning decades of shared experiences.

The turnout for the event was remarkable, with 80 pre-confirmed attendees and an additional 2 family members graciously joining, totaling 82 participants. This gathering marked a significant milestone for our alumni community, emerging as the largest event of its kind ever hosted in California. The diverse and substantial attendance underscored the enduring bonds that connect us, transcending time and generations.

Senior most Nripen-da (1960 CE, Acharya) with junior-most Rajyasri (2022 CE, Roy) with Raja-da (1969 CE, Basu), Chuni-da (1966 CE, Saha and Partha-da (1967 CE, Sircar)

Past, present, future and beyond

One of the evening's most striking aspects was the representation of various graduating classes, ranging from the seasoned graduates of 1960 to the fresh face of the class of 2022. This convergence of generations created an atmosphere rich with shared experiences and cherished moments, highlighting the timeless camaraderie among our alumni.

Examining the attendee list revealed that the median graduation year represented was 1995, showcasing the strength of our alumni network and indicating a positive trend in engagement, particularly among recent graduates. This increased participation reflects the growing enthusiasm and commitment within our alumni base.

Throughout the evening, conversations flowed freely as old friendships were rekindled and new connections were formed. From sharing career journeys to reminiscing about college days, each interaction reinforced the sense of belonging and camaraderie that defines our alumni community. As the event concluded, it was evident that the spirit of solidarity and friendship would endure beyond the night.

Special appreciation is owed to Prasanta-da (1982 ETC, De) and Dolly-di for their exceptional organization, from venue selection to post-event cleanup. Sudipto (2000 ME, Mukhopadhyay) demonstrated outstanding leadership in managing the food and services, while Jayanta-da (1986 EE, Lahiri) efficiently handled finances and coordination. Shyamali (1997 CST, Mukherjee), Rajib (1997 CST, Maitra), and Gourab (2003 EE, Basu) added to the enjoyment with their engaging activities including REBECA style family feud game and managing the dance floor. Volunteers like Abhishek (2006 EE, Das), Anjan (1991 CST, Kundu), Amit (1993 EE, Das), Nitya-da (1987 ETC, Mukherjee), and Pinaki (2001 CST, Sirker) made significant contributions to the success of the event. Special appreciation goes to Arun-da (1966 CE, Saha) for facilitating transportation for our youngest alum. Thanks to those who responded to Jayanta-da's appeal and brought beverages that many enjoyed. Lastly, heartfelt gratitude to everyone, including yourself and your family, for making this evening truly memorable.

For those who couldn't attend or want to reminisce, an **Album** from the event is available for viewing.

Let's continue to celebrate the bonds that unite us and look forward to many more memorable gatherings in the future!

Success Story of Abhrokanti Saha, 2015 CE

Source: https://startuppedia.in/nirnayan-healthcare-success-story/#:~:text=Stories-,Two%20Kolkata%20brothers%20dropped%20out%20of%20MBA%20to%20start%20Diagnostics,Rs%20150%20Cr%2B%20valued%20brand&text=In%202018%2C%20Subhra%20Kanti%20Saha,to%20provide%20various%20medical%20tests.

Two Kolkata brothers dropped out of MBA to start Diagnostics Lab Chain, builds a Rs 150 Cr+ valued brand

In 2018, Subhra Kanti Saha and Abhra Kanti Saha, based in Kolkata, started a small pathology lab called Nirnayan Healthcare to provide various medical tests.

The duo brothers came forward to share the journey of Nirnayan with **Startup Pedia**.

Hailing from a doctor's family where grandfather and father are doctors, the duo brothers Subhra Kanti Saha and Abhra Kanti Saha observed that the special medical tests, such as blood testing, were outsourced from West Bengal to big cities like Delhi, Mumbai, and Bangalore. They realized that filling this gap could be their forte.

Holding engineering degrees, the brothers were working in different MNCs. However, when they realized they could start their own business to fill the medical gap, they resigned from their respective jobs and dropped out of the MBA.

The duo saw the vision of making a healthcare brand from eastern India to facilitate and expedite the diagnosis with compassion.

Today, Nirnayan is one of Eastern India's largest, most respected, and most accredited brands. It will soon make its footprint across India and globally.

Subhra and Abhra have worked for the most reputed MNCs, including Cognizant, M.N Dastur, Levis, Wyndham, Tata Groups, Jindal, etc. After working with such companies with high remunerations, both left all their In-Creative Jobs and security, putting their family at stake; they started this venture in healthcare without having any domain knowledge to make their dreams successful, and now it is a reality.

"***We dropped out of MBA in the middle because we realized that if we want to do something out of the box, it cannot be learnt anywhere. We have to start doing and learn on the way***", Abhra said while talking to Startup Pedia.

The Nirnayan Healthcare co-founders went back to their native place.

Nirnayan Healthcare Office

With a humble start, investing around Rs 10-12 lakh for required machinery, they opened a 200-square-foot laboratory.

Being a B2B business, Nirnayan Healthcare collects blood samples from its clients, such as hospitals, processes them, and then provides accurate and fast reports.

Initially, the Duo brothers targeted tier 2 and tier 3 city hospitals and then onboarded hospitals from tier 1 cities. Their clientele are hospitals and doctors in various locations in West Bengal, including Kolkata and its surrounding areas.

"***We had a humble start. I still remember the first day when our laboratory did blood testing of 22 patients. Currently, we are***

processing more than 4,000 patient samples per day. This is a huge growth for us in the last five years," said Mr. Subhra.

Nirnayan Healthcare Services

Nirnayan Healthcare Lab

When the coronavirus pandemic hit, Nirnayan Healthcare was one of the leading labs for COVID-19 testing. Leveraging automation and advanced technologies, the brother-turned-founders Subha Kanti Saha and Abhra Kanti Saha expedited the testing process.

Looking at the critical situation during the pandemic, they are also implementing broad testing units, remote consultations, and contactless technologies.

The National Accreditation Board accredited Nirnayan Healthcare for testing and Calibration Laboratories (NABL) in 2019. This was a significant milestone for the business because the accreditation signified Nirnayan Healthcare's competence, reliability, and adherence to international quality standards.

What started with just 200 sq ft has now spread across a 15,000 sq ft lab and has a strength of over 400 employees.

The business has been growing 40-50% year on year financially. Nirnayan Healthcare clocked a revenue of Rs 30 crore in the financial year 2022-23. **"We are projecting Rs 200 crore revenue in the next two years,"** aims Subhra. Also, the current Asset Value of the business stands at Rs 50 crore, and the market value is Rs 150 Cr.

Shedding the light on expansion, Subhra said that Nirnayan Healthcare will have over 50 labs across India in the next five years.

Brothers making the business grow

Mr Subhra Kanti Saha – Co-founder & Co-CEO at Nirnayan Healthcare

Mr Subhra Kanti Saha is the Co-founder and Co-CEO who is currently looking after the Business Development and Information Technology wings of Nirnayan. The business has grown at least four times under his leadership between 2022 and 2023.

Under his guidance, Nirnayan has achieved end-to-end laboratory integration, eliminating pre-analytical and post-analytical errors, which helped Nirnayan provide the most accurate reports in the shortest possible time.

As the company scaled up and entered the B2C market, it strengthened its balance sheet and established itself as a visible brand.

Mr Abhra Kanti Saha – Co-founder & Co-CEO at Nirnayan Healthcare

Nirnayan's Technical, Operation, and Finance wings are currently under **Mr Abhra Kanti Saha** who is the Co-founder and Co-CEO of the company. Under his leadership, Nirnayan is constantly acquiring many upgraded, state-of-the-art technologies, helping Nirnayan emerge as the most advanced laboratory across Eastern India.

In the process of this upgrade, Nirnayan will soon make its position in the Leaderboard of Laboratories on the map of Our Country.

Under his guidance, Nirnayan's Logistics, operation and technical wing are integrated and optimized – to connect every dot starting from Tier 5 Cities to Tier 1 in collecting samples as quickly, precisely, and efficiently as possible.

Last year, the Kolkata-based medical diagnostics lab chain acquired the most advanced technologies like ICP MS, GC MS, and LCMS, through which Nirnayan started its journey in Medical diagnostics and medical research.

Nirnayan's social impact

In the rural areas, Nirnayan helped mankind by providing the most accurate report at the most affordable price. It has organized many camps during the year to help mankind get their daily health statistics.

During the COVID-19 pandemic, Nirnayan was one of the top laboratories that provided COVID reports in the shortest possible time to help people get their diagnosis, saving their lives.

Nirnayan Healthcare USP

Since its inception, Nirnayan has maintained quality service and become the market leader for providing the shortest turnaround time (TAT) for Super Special parameters like Oncogenomic, Genetic Disorders, etc.

Previously, they were being outsourced to other cities from eastern India, and eventually, reports would get delayed. Due to Nirnayan, people of Eastern India are getting those reports with accuracy in a much shorter time.

FAQs

What is Nirnayan Healthcare?

Nirnayan Healthcare is a Kolkata based Medical Diagnostics Lab Chain that collects blood samples from its clients, such as hospitals & Doctors, processes them, and then provides accurate and fast reports.

Who are the founders of Nirnayan Healthcare?

Subhra Kanti Saha and Abhra Kanti Saha, based in Kolkata, are the co-founders of Nirnayan Healthcare.

What is the revenue of Nirnayan Healthcare?

Nirnayan Healthcare has clocked a revenue of Rs. 30 crore in the financial year 2022-23.

Where is Nirnayan Healthcare based?

It is based in Kolkata but plans to spread across India in the next five years.

GAABESU
Global Alumni Association of Bengal Engineering and Science University, Shibpur
University Guest House
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur
(Erstwhile Bengal Engineering and Science University/B. E. College, Shibpur)
Po.: Botanic Garden, Howrah, West Bengal, India - 711103

Success Story of Subrata Biswas , 2011-IT

Source:https://ians.in/pr-wire-detail/adaptive-gen-ai-startup-cimbaai-emerges-from-stealth-with-pre-seed-funding-to-optimize-data-driven-business-operations-06-02-2024

Cimba.AI, the Gen AI-native platform that gives enterprises the power to create custom AI agents that produce deep insights, recommend and trigger business actions, has officially come out of stealth with $1.25M in Pre-Seed funding. The round was led by Ripple Ventures, with participation from SeaChange, PackVC, and angel investors like **Chad Sanderson** and **Chris Riccomini**.

By training itself using existing organizational data, Cimba constantly adapts its knowledge base without the need for data scientists to manually feed it info - something that has been costly and inefficient for growing businesses to do.

Cimba.AI's unique platform uses self-training artificial intelligence that adapts to an organization's specific knowledgebase, including dashboards, query history, metadata, and playbooks. Business operations teams, such as CS, RevOps, and SalesOps, can leverage these AI agents to tackle intricate business goals and trigger subsequent actions based on their data in the data warehouse, such as Snowflake. Users can get complex and open-ended insights using a simple natural language query, such as the customers requiring attention this week or strategies to improve a marketing campaign within a few minutes on Cimba.

Cimba is the only AI-native application platform that can help with these kinds of complex business objectives using highly customizable and adaptive agents that sit on a company's structured and unstructured data. The majority of LLMs available for public consumption are generic and do not contain organization-specific context. This is a major roadblock when considering Generative AI adoption for an enterprise.

"Most enterprises are scared to adopt AI in their critical business operations as they are required to train or finetune LLMs with their knowledge and data, which can cost millions and be ineffective for their workflow and ROI," says Subrata (Subu) Biswas, Co-Founder & CEO at Cimba.AI. "Creating an easy to use, cost effective platform for businesses to train AI and utilize those in their day-to-day business operation is our mission at Cimba."

Cimba created an agent-network-based AI platform layer on top of various open-source and closed-source large language models (LLM) to achieve this. This method is highly cost-effective, potentially saving millions in LLM retraining costs for businesses. Cimba.AI's platform marks a significant advancement in the practical application of Generative AI in the business world.

Enterprises start benefiting from Cimba within a week by incrementally shipping specialized agents with a limited set of data and knowledgebase without being worried about larger-scale data quality challenges.

Cimba provides both business users and data practitioners with a simple, intuitive interface to turn their data into useful business actions with the following unique capabilities:

- **Text-to-workflow to solve complex business challenges** - Business users often look for open-ended answers requiring multiple repetitive data exploration steps following some contextual playbook.
- **Trigger action from insights** - AI can suggest the next recommended actions, agents can help trigger those.
- **Train AI agents using SQL & Natural Language** - Users can train our adaptive AI agents using a simple feedback loop, natural language, or SQL.

"We invested in Cimba.AI, captivated by the vision and expertise of Subu Biswas and Vishal Das, whose backgrounds with tech giants have uniquely positioned them to lead in the evolving space of adaptive and generative AI," says Dom Lau,

Partner at Ripple Ventures. "Their approach to AI-driven business operations is not just innovative; it's the future. We're excited to see how their leadership will shape the next wave of AI solutions, transforming decision-making and operational efficiency across industries."

"Cimba.AI's strength lies in its ability to automate repetitive and time-consuming data analysis tasks by training custom agents to act as a natural language interface with relational data," said Vineeth Loganathan, Director of Data Science at ViralGains. "With Cimba, we aim to significantly boost productivity and efficiency to our campaign management and customer success teams this year."

Cimba.AI is currently in private beta with a strong list of mid to large-sized enterprise customers. To book a demo or join the waitlist, visit **https://www.cimba.ai/**.

About Cimba.AI

Cimba.AI is the adaptive Gen AI-based analytics agent infrastructure. It helps organizations optimize their business operations at scale by generating dynamic workflows and triggering actions using natural language via adaptive analytics AI agents. With founders **Subrata Biswas**, ex- Microsoft and Amazon software engineer who built the Airbnb data quality platform, and **Vishal Das**, a PhD from Stanford University and former Applied Scientist at AWS AI – Cimba is built from a deep understanding of analytics and AI's pain points and its market landscape. Cimba's AI infrastructure is the most cost-effective way to contextualize and leverage LLMs in business operations. It saves businesses millions of dollars in re-training and operationalizing LLMs.

Success Story of Arup Dash , 1998 ETC

Source:https://www.infosys.com/newsroom/press-releases/2024/acquire-semiconductor-design-services.html

Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) a global leader in next-generation digital services and consulting, today announced a definitive agreement to acquire InSemi, a leading semiconductor design and embedded services provider. This strategic investment further strengthens Infosys' Engineering R&D capabilities and demonstrates its continued commitment to co-create with global clients to help them navigate their digital transformation journey.

Semiconductors are at the heart of the technology which is driving exponential growth of Artificial Intelligence (AI), 5G, Hyperconnectivity, High Performance Computing, Quantum Technology, Virtual Reality, IoT and Smart Devices. This collaboration will help accelerate Infosys' Chip-to-Cloud strategy, by bringing niche design skills at scale and will also pair seamlessly with existing investments in AI/Automation platforms and industry partnerships. The collaboration will aim to orchestrate comprehensive end-to-end product development for clients.

Founded in 2013, InSemi offers end-to-end semiconductor design services with expertise across electronic design, platform design, automation, embedded and software technologies. It serves leading global corporations across semi-conductor, consumer electronics, automotive, and hi-tech industries. InSemi is growing expeditiously and a team of over 900+ design specialists bring in the competitive advantage, agile mindset, and an innovative approach to build technology-led solutions that transform businesses.

Dinesh R, EVP & Co-Delivery Head, Infosys, said, "Infosys has been a leader and at the forefront of delivering cutting edge solutions across industries with Engineering R&D services. With the advent of AI, Smart devices, 5G and beyond, electric vehicles, the demand for next-generation semiconductor design services integrated with our embedded systems creates unique differentiator. InSemi is a strategic investment as we usher a next wave of growth and a leadership position in Engineering R&D."

"Over the last five years, InSemi has built a foundation with solid growth and design capabilities across the semiconductor value chain. With Infosys as our catalyst, it creates a synergistic combination that allows us to scale and bring the power of AI & Engineering R&D and next-generation technology to global clients, expanding across industry sectors. We aim to further accelerate our progress and together with Infosys, it paves a path of innovation opening new opportunities for our teams", said **Shreekanth Sampigethaya & Arup Dash, Co-Founders, InSemi**.

A Lion's Den and Our Roommate Tarun

Jayanta Mazumdar | 1963 MET

We were in the second year. Our College principal would be always in our talk. A magnetic personality packed in a small frame; a wonderful diction in Queen's English in a soft but clear voice. He would accept no nonsense from his college boys and yet he had a deep feeling for each of the two thousand students in the campus. The junior students, specially from the first and the second year, were more scared of him though they would regard him as a Demi-god.

Principal's living quarter was an old, large , double storied Tudor mansion and this mansion, too, was mysterious to us, the junior boys. In the campus we would often go around his living quarter , glancing at it with curiosity and scare, lest the lion himself suddenly emerges from his den and confronts us.

Into this fearful Lion's Den , our second year room mate Tarun once dragged three of us well after midnight, not once but twice and forced us to confront the lion, pulling him out of his night sleep. It is a bizarre story and It would have been a comic had it not been so tragic.

Final examinations were going on. We the second year boys were in extra stress; previous year only about 40 students in our batch of 400, could pass in all subjects and if now we do poorly again, some of us may have to repeat (stay back) in the second year and lose a whole year! My room mates were Robin, Sarat and Tarun (name changed). We were studying hard in the hot summer in our fan- less hostel rooms. Tarun was a frail boy , the smallest one in size in our class. The fact that Tarun was slowly breaking down under the examination stresses , we, his three roommates , could not fathom at all. We were in- experienced and engrossed in our own studies .

Examinations are going on , and one late night , when we the room mates are still at our desks but planning to retire for the night, Tarun suddenly shouts at us in an unusually shrill voice—- " I know you guys are conspiring against me ! As soon as I go to sleep you will wrap me up in my mosquito net, and throttle me dead . I am going to the principal to complaint!" —— And he dashes off, barefoot and just in a pajama and a vest.

We three, Rabin, Sarat and I, are absolutely stunned! However we quickly decide to follow Tarun, in our own pajama- vest attire and run towards the Lion's Den . Later on we realize that all 300 students of our cluster of three hostels gave up their studies and assembled below the principal's quarter to give us moral support.

The guard at the gate was very much alert and confirmed that a babu has just come in and now waiting upstairs for the principal, on whose bed room door the watchman himself has knocked to wake him up. He again leads three of us upstairs and we enter the den. Tarun is seated in a corner. We three sit at another corner. Then our principal emerges from inside, wrapped in a dressing gown. He takes a quick look at all four of us, takes a seat and waits silently.

Tarun springs up, points his fingers towards us and says " Sir, these are my room mates and they steal all the letters that my girlfriend writes to me." Another bolt from the blue so to say! The principal is unperturbed — " Where does your girl friend live? " Tarun— " Sir, in Jalpaiguri. I am from Jalpiguri too, Sir."

This immediately creates a bond, as our Principal himself was from the same place.He skillfully and softly questions Tarun and find out all the details of Tarun's parents and family. Then the great man addresses the agitated boy— " My boy. You study seriously and be an engineer from Shibpore. Then dozens of girls would like to be your girl friend and will write you letters . Tomorrow morning you have an examination. Now just go back to your room and have a sound sleep . Tarun takes a glance at us and leaves the room. The great man silently nods to us to go back too .As we emerge from the lion's den, we find a crowd of hostel mates anxiously waiting for us abandoning studies. Such was the spirit of togetherness in our College!

We go to bed exhausted. In a few hours we have to appear in our ET Lab examination! Jesus Christ! But our fate that night was more cruel. Within an hour Tarun springs out of his bed, yells, and shots out of the room and runs in the direction of the river Ganges flowing across our campus boundary. We three get up, run to Lion's Den again and wake up the sleeping lion again with the help of the guard. We express our anxiety that Tarun might throw himself into the river! The wise man that our Principal was, he orders that no student should try to search for Tarun at this hour of night. The security guards at dawn would surely find him hiding somewhere inside the campus.

Then the great man hands over a piece of paper and asks us to write down our names and roll numbers on it. He says softly— " You boys are in no shape to appear in tomorrow's exam. Go back and sleep through the night and till late morning. Your ET Lab exam will be held another day ." We are overwhelmed by his kind gestures.

Next morning Tarun was found hiding behind some bushes. He was mad by then and was lodged in the campus hospital. His father was informed and the old man came and took away his mentally ill son back home. Rabin, Sarat and I had a terrible feeling of guilt. How did we fail to notice at all that our Tarun was slowly turning mad ?.

Ten years have passed. I am working in Kolkata. Both Rabin and Sarat are teaching at Durgapur. On a winter afternoon I suddenly bump into Tarun at the BBD Bag (Dalhousie Square). He is neatly dressed, looking happy and relaxed. We hug each other and sit at a bench in the park and sip tea served in bhnar (earthen pots) and chat. Tarun's story is a happy one. He lost a year resting at home and then joined directly in the final year of LME in the local technical school and came out with ranks and since then is with the Calcutta Telephone as an assistant engineer.

A massive load was off my chaste after a long 12 years. On Saturday I take a train to Durgapur to meet Rabin and Sarat and become a night guest of Rabin at the NIT . Sarat , too, comes over and join us. I describe to them about my chance meeting with a happy Tarun at Kolkata . Now my two friends feel as mentally relieved as me. We three roommates eat and drink and chat about our hostel day till well past midnight.

রবীন্দ্রসূত্রে শান্তিনিকেতনের বিদেশী অতিথি-অধ্যাপক

Debasish Bondopadhyay | 1981 ETC

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা আর এর অন্যতম ক্ষেত্র হল বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "বিশ্ববিদ্যলয়ে আমরা সকলে একত্রিত হয়ে সর্বসম্মত সত্যকে আবিষ্কারের কাজে লাগাতে পারি, সবাই মিলে আমাদের সাধারণ ঐতিহ্যকে পরস্পর বুঝতে পারি এবং উপলব্ধি করতে পারি এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা যে রূপসৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, বিজ্ঞানীরা ব্রহ্মাণ্ডের যে রহস্য আবিষ্কার করেছেন, দার্শনিকরা আমাদের অস্তিত্বের যে সমস্যার সমাধান করেছেন, সাধুসন্তরা তাঁদের জীবনের উপলব্ধ যে আধ্যাত্মিক সত্য উদ্ভাবন করেছেন সেগুলি কোন [বিশেষ] জাতির জন্য নয়, সমগ্র মানব জাতির জন্য।..." আসলে এটি রবীন্দ্রনাথের লিখিত একটি ইংরেজি পুস্তিকার (An Appeal For An International University) বাংলা অনুবাদের অংশ। অনুবাদক হলেন অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। এই পুস্তিকাটির Aims and Objects: 'The university of Santiniketan tries to realise its harmony with the history and spirit of India itself, gathering together the different cultures of Asia, and along with it to accept the best culture that the West has produced in science, literature, philosophy and the arts.'

এই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ, আমেরিকার ও এশিয়ার প্রাচ্যবিদ্ পন্ডিতবর্গকে অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের সেই বিদেশী অতিথি-অধ্যাপকদের সামান্য কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া হল। অনেকেই হয়তো বাদ পড়েছেন। পাঠক তোমার কাছে যদি আরও কোনও পন্ডিতবর্গের (বিদেশী অতিথি-অধ্যাপক)খবর থাকে তো আমায় জানিও।

রবীন্দ্রনাথের খুব কাছের মানুষ C. F. Andrews (১৮৭১-১৯৪০), কৃষিবিদ্ Leonard Knight Elmhirst (১৮৯৩-১৯৭৪), William. W. Pearson (১৮৮১-১৯২৩), Patrick Geddes [প্যাট্রিক গেডিস (১৮৫৪-১৯৩২)], Dr. Stanley Jones (১৮৮৪-১৯৭৩), A. Bakhman, Alain Daniélou [আলাঁ দানিয়েলু (১৯০৭-১৯৯৮)], সমাজ-সেবিকা Gretchen Green (? - ১৯৭১) অথবা কৃষিগবেষক Dr Bernard Bay - এঁদেরকে এই তালিকা থেকে বাদ রাখছি কারণ এঁরা সেই অর্থে ঠিক শান্তিনিকেতনের অতিথি অধ্যাপক নন। এঁরা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন সফল করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এক একজন দরদী কর্মী হিসাবে। এই রকম আরও অনেক বিদেশী কর্মী আছেন যাঁদের এখানে রাখা গেল না।

ফের্না বেনোয়া [Fernand Benoit (১৮৯২-১৯৬৯)] সুইস-ফরাসি অধ্যাপক বেনোয়া ১৯২১ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে তাঁর ভারত ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আগ্রহের কথা জানান। রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে। বেনোয়া জানান তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য ও দর্শন পড়েছেন এবং তিনি সুইৎজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, রুমানিয়া ও তুরস্কে শিক্ষকতা করেছেন। তখন তাঁর বয়স ৩৫ বছর। তাঁর ইচ্ছা যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেকে যুক্ত করবেন। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে বেনোয়াকে জ্যুরিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন এবং দেখা হলে তিনি বেনোয়াকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানান। ১৯২২-এর জুলাই মাস থেকে বেনোয়া শান্তিনিকেতনের স্থায়ী অধ্যাপক পদে যোগ দিয়ে ফরাসি ভাষা শিক্ষার কাজ নেন। বেনোয়া ১৯২৭-এ শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান। সাময়িকভাবে হলেও শান্তিনিকেতনে ফরাসি ভাষাচর্চা বন্ধ হওয়ার মুখে পড়েছিল।

সিলভ্যাঁ লেভি [Sylvain Levi (১৮৬৩-১৯৩৫)] – শান্তিনিকেতনে আসেন ১০ নভেম্বর ১৯২১-এ এবং শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন পরের বছর ১০ আগস্ট। প্রথম বিদেশি অতিথি অধ্যাপক হিসাবে সস্ত্রীক আসেন অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি। অধ্যাপক লেভি এখানে তিব্বতি ও চিনা ভাষা শেখাতে শুরু করেন এবং মাদাম লেভি প্রথম থেকেই রোজ ফরাসি ভাষার সর্বোচ্চ শ্রেণিতে ক্লাস নিতে থাকেনামুজতবা আলী বলেছেন: "ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ববিষয়ে লেভির অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল তো বটেই; তদুপরি বৌদ্ধধর্মে বোধহয় তখনকার দিনে [১৯২১] পশ্চিমে এমন কেউ ছিলেন না যিনি তাঁর সামনে সাহস করে দাঁড়াতে পারতেন।"

মোরিৎস ভিন্টারনিৎস [Moritz Winternitz (১৮৬৩-১৯৩৭)] - প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মোরিৎস ভিন্টারনিৎস-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় ১৯২১ সালে প্রাগ-এ। সেখানেই কবি তাঁকে বিশ্বভারতীর অতিথি অধ্যাপক হিসাবে আমন্ত্রণ জানান। ১৯২২-২৩-এ নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে তিনি প্রায় এক বছর পড়ান। ভিন্টারনিৎস শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২২-এর ডিসেম্বর মাসে। শান্তিনিকেতনে এসে তিনি ছাত্রদের সামনে হাতে লেখা পুঁথি নিয়ে সংস্কৃত গদ্যাংশ খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়াতেন, ব্যাকরণ থেকে আরম্ভ করে অলংকারের কঠিন কঠিন বিষয় তারই সঙ্গে পড়ানো হত। আর আশ্রমের সকলের সামনে বক্তৃতা দিতেন ভারতীয় সাহিত্য ও মহাভারতের উপর। পুণা থেকে তখন তাঁর জার্মান ভাষায় লেখা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (Geschichte der Indischen Literatur) -এর ইংরেজি অনুবাদ শান্তিনিকেতনে কিস্তিতে কিস্তিতে আসছিল। তিনি সেগুলি থেকেও শ্রেণীকক্ষে পাঠ করতেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সূত্র ধরে তাঁর জগৎ ও মনন সম্পর্কে অবহিত হয়ে ভিন্টারনিৎস তাঁর সম্পর্কে অনেকগুলি রচনা প্রাগ-এর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখেন। জার্মান ভাষায় তাঁর লেখা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও জীবনবীক্ষা (জার্মান নাম Rabindranath Tagore : Religion und Weltanschauung des Dichters) একটি পৃথিবী বিখ্যাত বই। মুজতবা আলী এই বইটির প্রভূত প্রশংসা করে বলেন :"আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ, তাঁর ধর্ম, তাঁর সাধনা সম্বন্ধে আমি যে-সব পুস্তক পড়েছি তার মধ্যে আমি পন্ডিত, সাধক, দ্রষ্টা অধ্যাপক মরিৎস উইন্টারনিৎসের এই অতি ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ আসন দিই।" বইটির বাংলা অনুবাদ করেন দেবব্রত চক্রবর্তী (‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবির ধর্ম ও বিশ্ববীক্ষা’, পৃ-৮৮, বিশ্বহৃদয় পারাবারে - মোরিৎস ভিন্টারনিৎস, প্রকাশক - সিগনেট প্রেস, কলকাতা) ইংরেজি অনুবাদ Rabindranath Tagore : The Poet's Religion and World Vision, প্রকাশক : Winternitz Society for Literature and Culture, Kolkata)|

ভিনসেন্স লেসনি [Dr. Vincenc Lesney (১৮৮২-১৯৫৩)] - ইনি ছিলেন বিখ্যাত ভারতত্ত্ববিদ্। চেক ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে নতুন রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়াতে(এই রাষ্ট্রের জন্ম ১৯১৮)আসার আমন্ত্রণ জানান। রবীন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চেক বিশ্ববিদ্যালয়ে "The Message of the Forest” প্রবন্ধটি পাঠ করেন (১৮ই জুন, ১৯২২, সকাল এগারোটায়)। ভিনসেন্স লেসনিকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর অতিথি অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিতে আহ্বান করেন। লেসনি ছিলেন চেক বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক। তিনি শান্তিনিকেতনর আশ্রমে এক বছর ছিলেন (১৯২২ - ২৩) এবং ছাত্রদের গ্রিক ভাষা ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। তাঁর অমায়িক চরিত্রে, নিষ্ঠায় এবং পান্ডিত্যে আশ্রমবাসী সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি যতদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন একটু একটু করে বাংলা ভাষাও শিখে নেন। লেসনি গুরুদেবের 'লিপিকা' থেকে 'তোতাকাহিনী' চেক ভাষায় অনুবাদ করেন। নন্দলাল বসু লেসনি সম্বন্ধে বলেছেন: "ইনি এলেন প্রাগ থেকে। লম্বা চওড়া চেহারা, মাথায় প্রকান্ড একটি টাক। ইনিও বাংলা শিখে নিলেন অল্পদিনে।শিখে নিয়ে গুরুদেবের কবিতা, নাটক অনুবাদ করতে লাগলেন। অনুবাদ করলেন চেক ভাষায়।“

বিশ্বভারতীর একটি বিশেষ অধিবেশনে(এপ্রিল ১৯২৩)লেসনি 'Sanskrit and Slavonic Languages' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। প্রথমে তিনি চেক ও অন্যান্য শ্লাভীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ায় সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চা কিভাবে আরম্ভ হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। অবশেষে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া রাজ্য ও তার শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলে তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করলেন।

কার্লো ফর্মিকি [Carlo Formichi (১৮৭১-১৯৪৩)] - ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে ফর্মিকি শান্তিনিকেতনে আসেন। মুজতবা আলী বলেছেন : "অধ্যাপক ফর্মিকির নাম এদেশে সুপরিচিত নয়, কিন্তু ইতালির পন্ডিত মাত্রই জানেন, সে দেশে সংস্কৃত-চর্চার পত্তন ও প্রসারের জন্য তিনি কতখানি দায়ী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল অবিচল অনুরাগ এবং গভীর নিষ্ঠা। অধ্যাপক তুচ্চি তাঁর অন্যতম সার্থক শিষ্য। ....অধ্যাপক ফর্মিকি শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত পড়াবার সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন' 'জানো', সমস্ত জীবনটা কাটল ছাত্রদের সংস্কৃত ধাতুরূপ আর শব্দরূপ শিখিয়ে। রসিয়ে রসিয়ে কাব্যনাট্য পড়ানো আরম্ভ করার পূর্বেই তাদের কোর্স শেষ হয়ে যায়-তারা তখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ করে দেয়। জীবনে এই প্রথম শান্তিনিকেতনে সুযোগ পেলুম পরিণত-জ্ঞান ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাব্যনাট্য পড়ার। ব্যাকরণ পড়াতে হচ্ছে না, এটা কি কম আরামের কথা।" অধ্যাপক ফর্মিকি ১৯২৬-এ ইতালি ফিরে যান।

জিয়োসেপ্পে তুচ্চি [Giuseppe Tucci (১৮৯৫-১৯৮৪)] - ভারত-তিব্বত-চীনের ইতিহাস এবং বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ এবং দেশদেশান্তরে তার প্রসার সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। মুজতবা আলী বলেছেন:"বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে সব শাস্ত্র সংস্কৃতে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তিব্বতী এবং চীনা অনুবাদে পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে তিনি নানাপ্রকার তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস নির্মাণ করেছেন, সে ইতিহাস ভারতের গৌরব বর্ধন করেছে"। রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ করে ইতালি থেকে অধ্যাপক ফর্মিকি ও তুচ্চিকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। ১৯২৫ সালে এঁরা দুজন ভারতবর্ষে আসেন। আচার্য তুচ্চি পড়াতেন ইতালিয়ান সাহিত্য।

মিস স্টেলা ক্রামরিশ [Dr. Miss Stella Kramrish (১৮৯৫-১৯৯৩)] বিশিষ্ট অস্ট্রিয়ান শিল্পবিশেষজ্ঞার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয় [১৯২০] অক্সফোর্ডে। স্টেলা এসেছিলেন অক্সফোর্ডে ভারতীয় শিল্পের উপরে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার শেষে রবীন্দ্রনাথ স্টেলার সাথে আলাপ করেন এবং তাঁকে কলাভবনে যোগ দিতে আহ্বান করেন। সেই সময়ে ইংল্যান্ডের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক থাকার ফলে অস্ট্রিয়ান স্টেলা ক্রামরিশ অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সুপারিশে ভারতে আসার অনুমতি পেয়েছিলেন।

স্টেলা আশ্রমে আর্ট-সমালোচক রূপে যোগ দেন। বিশ্বভারতীতে তিনি জার্মান ভাষাও শিক্ষা দিয়েছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছোট ছোট বালিকাদের মিউজিক্যাল ড্রিলও তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। এছাড়া স্টেলা ক্রামরিশ শিল্পকলা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ মিশর, এসেরিয়া, গ্রিস ও ইতালির শিল্পকলার বিষয়ে পর্য্যন্ত বক্তৃতা দেন। ক্রমে তিনি মধ্যে এশিয়া, চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের শিল্পকলা সম্বন্ধেও বলেন।

মিস শ্লোমিথ ফ্লাউম - Miss Schlomith Flaum (১৮৯৩-১৯৬৩) - এক শিক্ষিকা যিনি প্যালেস্টাইন থেকে আসেন(১৯২৩ সালে)| ইনি ইউরোপের প্রায় সব ভাষা ভালরূপে জানতেন এবং Hebrew ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বহুদিন চর্চা করেছেন। ইনি রোমে গিয়ে আধুনিক Montessori method শিক্ষা করে সেখানকার ডিগ্রী পান এবং পরে আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে General pedagogies - সাধারণ শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। আমেরিকায় গুরুদেবের সহিত এনার সাক্ষাৎ হয় এবং তখনই শান্তিনিকেতনের আদর্শে

তিনি আকৃষ্ট হন। গুরুদেবের অনুরোধে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন এবং দু'বছর থেকে আধুনিক কিন্ডারগার্টেন প্রণালীতে ছোট ছেলেমেয়েদের শেখাবার ভার নেন এবং বিশ্বভারতীর ছাত্রদের জার্মান ভাষা শিক্ষায় সহায়তা করেন। ইনি বাংলা শিখে গুরুদেবের কিছু কিছু বই হিব্রুতে অনুবাদ করেন। তিনি প্যালেস্টাইনে ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শে ছোটদের জন্য একটি স্কুল খোলেন।

আঁদ্রে কার্পেলেস [Andrée Karpélès (১৮৮৫-১৯৫৬)] - আঁদ্রে কার্পেলেস ছিলেন একজন ফরাসি চিরশিল্পী। আঁদ্রে খুব বেশিদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। ১৯২২-এর ডিসেম্বরে তিনি আসেন, আর ফ্রান্সে ফিরে যান পরের বছর এপ্রিল মাসে। তিনি শান্তিনিকেতনে আসার আগেই শান্তিনিকেতন পত্রিকায় লেখা হয় : " প্যারী সহর হইতে Melle Andrée Karpélès নামে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পূজার ছুটির পরে এখানে আসিয়া বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের কার্যে যোগদান করিবেন। ইনি পূর্বে আরো কয়েকবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইনি কলাভবনে স্বহস্তে অঙ্কিত গুরুদেবের একটি তৈলচিত্র উপহার দিয়েছেন।" (শান্তিনিকেতন, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩২৯)।

পাঁচ মাসও তিনি শান্তিনিকেতনে থাকার সুযোগ পাননি। কিন্তু এই স্বল্পবাসে শান্তিনিকেতনের জীবনে একটা ছাপ রেখে যেতে পেরেছিলেন। কলাভবনের 'বিচিত্রা' কারুসংঘ প্রতিমা দেবী ও তাঁর উদ্যোগেই স্থাপিত হয়েছিল। আঁদ্রের কাছে ছাত্রছাত্রীদের পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অয়েল পেন্টিং শেখার সুযোগ ঘটে। আঁদ্রে ছিলেন কাঠখোদাই, এনগ্রেভিং-এর কাজে দক্ষ। 'বিচিত্রা'-র ছাত্রছাত্রীদের তিনি উডকাট ও অয়েল পেন্টিং শেখাতেন।

যদিও আঁদ্রের ইচ্ছে ছিল দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয় নি। তাঁর বিদায় অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে

"ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।" গানটি গাওয়া হয়েছিল। গানটি কবিগুরু আঁদ্রের বিদায় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন।

স্টেন কোনো [Sten Konow (১৮৬৭-১৯৪৮)] - স্টেন কোনো ছিলেন একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ভারতবিদ্। নরওয়ের অসলো শহরের ক্রিস্টিয়ানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন (১৯১০)।পরবর্তীকালে (১৯১৪)হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি পড়াতেন। নরওয়ের এই সুইডিশ ভারতবিদকে রবীন্দ্রনাথ অল্প চিনতেন। রবীন্দ্রনাথের আবেদনে স্টেন কোনো শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন (১৯২৪-২৫)। তিনি হলেন শান্তিনিকেতনের তৃতীয় বিদেশী অতিথি অধ্যাপক। এর আগে সিলভ্যাঁ লেভি ও মোরিৎস ভিন্টারনিৎস শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। অনেক আগে (১৯২১-২২) রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশে নিয়ে যাওয়ার খুবই ইচ্ছে ছিল স্টেন কোনোর। রবীন্দ্রনাথও নরওয়ের সাহিত্য চর্চায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। স্টেন কোনোর আহ্বানের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন : "Nothing could be given me keener pleasure than to be able to visit Norway and come in touch with your people, who have deeply attracted me with their great literature."

স্টেন কোনোর পান্ডিত্যের কথা রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নরওয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি ১৯২৬-র ইউরোপ সফরে তিনি রক্ষা করেন।

মার্ক কলিন্স [Dr. Mark Collins (১৮৬৬-১৯৩?)] - ভারতবিদ্ মার্ক কলিন্স ছিলেন ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক (১৯০৮-১৯১৪). পরবর্তীকালে তিনি ভারতে এসে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯১৯ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে যোগদেন ১৯২২ সালে। শান্তিনিকেতনে তিনি ভাষাতত্ত্বের অতিথি অধ্যাপক হিসাবে ছিলেন ১৯৩১ পর্যন্ত। প্রায় চল্লিশটি ভাষায় তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। শান্তিনিকেতনের টাটা ভবনের ধুলো, মাকড়সার জাল, ও ইঁদুর ভর্তি দু'কামরার ছোট নিবাসে দিনরাত অধ্যয়ন রত থাকতেন। খুব কম লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্তা ছিল তাঁর। পরবর্তীকালে জানা যায় এই আবরণের পিছনে একটি দুঃখজনক ঘটনা ছিল। নিজের উচ্ছৃঙ্খল পত্নীর থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য শান্তিনিকেতনে লুকিয়ে ছিলেন। একদিন হটাৎ তাঁর পত্নী শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলে সবকিছু পরিত্যাগ করে চুপচাপ তিনি একলা কোথাও চলে যান।

বগদানফ্ [L. Bogdanov] - ১৯২৩-এ বিশ্বভারতীতে যোগ দিলেন রুশীয় অধ্যাপক বগদানফ্। তিনি সেন্ট পিটাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা দিতেন। এই দুটি ভাষা আয়ত্ত করার জন্য তিনি বহুকাল তুরস্ক ও পারস্য দেশে ছিলেন। রাশিয়ায় সোভিয়েত শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় জারতন্ত্রী যে-সব রুশীয় পন্ডিতকে দেশত্যাগ করতে হয় তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এর ফলে বহুদিন তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর দুঃখের কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্বভারতীতে নিয়োগ করেন। তাঁর আগমনে এখানে ফারসি ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি, মৌলানা জিয়াউদ্দিন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পার্সিয়ান কাব্য ও সুফীবাদ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। ১৯৩০-তে তাঁকে বিদায় দেওয়া হলে তিনি কাবুলে চলে যান।

পল রিশার [Paul Antoine Richard (1874 – 1967)]

শান্তিনিকেতনের শুরুর আমলে ফরাসি ভাষা শেখানোর দায়িত্ব পান মরিস ভাই। পুরো নাম হিরজিভাই পোস্তোনজি মরিসওয়ালা। কিন্তু যখনই কোনো ফরাসিভাষী মানুষ শান্তিনিকেতনে এসেছেন, তাঁকেই ফরাসি শেখানোর কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। যেমন ছিলেন পল রিশার। জাপানে পিয়ারসনের সঙ্গে আলাপের সূত্রে কবির সঙ্গে পল রিশারের যোগাযোগ। তাঁর লেখা 'To the Nations' গ্রন্থের ভূমিকা পিয়ারসনের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন। ফরাসি এই চিন্তাশীল ব্যক্তি ১৯২১-এর জানুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তাঁর পত্নী মিরা রিশার (Mirra Alfassa) শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম স্থাপনে উদ্যোগী হন ও সেখানেই আজীবন সাধনা করেন।পরে তিনি 'মাদার' (The Mother or La Mère) নামে পরিচিত হন।

পল রিশার শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন (পাঁচ সপ্তাহ) ফরাসি ভাষার ক্লাস নেন এবং ছাত্ররা খুবই উপকৃত হয়। মরিস ভাই এই সুযোগে তাঁর কাছ থেকে ফরাসি ভাষার কথোপকথনের পাঠ গ্রহণ করেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে চার্লস এন্ড্রুজের প্রাক্তন ছাত্র নসিরুল্লা ও তাঁর ফরাসি স্ত্রী (নাম ?) আশ্রমে আসেন। নসিরুল্লা উর্দুভাষার পাঠ দিতেন ও তাঁর স্ত্রী পড়াতেন ফরাসি ভাষা। এছাড়া ফরাসি প্রফেসর শ্রীমতি এমি হিস্যাযার (Aimee Hissaire) শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ১৯২৯ সালে। তিনিও বোধহয় শান্তিনিকেতনে ফরাসি ভাষা শিক্ষা দিতেন।

সানো জিন্নোসুকে (Sano Jinnosuke) ১৯০৫ সালে জিজুৎসু শিক্ষা ও জাপানি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন তিন বছর। এখানে কিছু পূর্বকথা বলা দরকার। জানুয়ারি, ১৯০২-এ বিখ্যাত জাপানী শিল্পশাস্ত্রী কাউন্ট ওকাকুরা কাকুজো (Okakura Kakuzo (১৮৬২-১৯১৩)] কলকাতায় আসেন স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানের একটি ধর্মসভায় নিয়ে যাওয়ার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে। স্বামীজীর জাপান যাওয়া হয়নি এবং সাত মাস পরেই (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) তাঁর মৃত্যু হয়। তবে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রম্যাঁ রলাঁকে বলেন, "বিবেকানন্দ তাঁকে [ওকাকুরাকে] বলেছিলেন, 'এখানে আমার সঙ্গে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি এখনো জীবনের মধ্যে আছেন।"

কিন্তু ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথের কাছে যতটা গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের অনেকে তাঁর দিকে এগিয়েছিলেন অনেক বেশি। অবনীন্দ্রনাথ ও গগেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পর ওকাকুরা দেশে ফিরে টাইকান য়োকোয়ামা [Taikan Yokoyama (১৮৬৮-১৯৫৮)] ও হিসিদা সুনসো [Hisida Sunso] নামে দু'জন শিল্পীকে জোড়াসাঁকোতে পাঠিয়ে দেন - নব্য বাংলার চিত্রকলায় এই দুই শিল্পীর প্রভাব যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য তিনি কুসুমতো সান (Kusumoto-san) ও কোনো সান (Kōno-san) নামে দু'জন দারুশিল্পী ও জুজুৎসু শিক্ষার জন্য সানো জিন্নোসুকে পাঠিয়ে দেন।

শিনজো তাকাগাকি - Shinzo Takagaki (1893–1977) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানে জুজুৎসু ও জুডো পদ্ধতির সাহায্যে খালি হাতে লড়াইয়ের প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অস্ত্র আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ ভারতবাসীর হাতে সামান্য একটি লাঠিও রাখা তখন নিষিদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, জুজুৎসু ভারতবাসীর অস্ত্রের অভাব ঘোচাতে পারবে। জাপানে তিনি ব্যবস্থা করে এসেছিলেন, সেই অনুযায়ী জাপানের সুবিখ্যাত জুজুৎসু শিক্ষক তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে। ছাত্র ছাত্রীদের জুজুৎসু শেখানোর উদ্দেশ্যে। এঁর জন্য দু'বছর প্রায় চোদ্দ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ - টাকার অঙ্ক থেকে আন্দাজ করা যায় তাঁর উৎসাহের পরিমান। কিন্তু কোনো স্থায়ী কাজ হয় নি। দুর্ভাগ্যের যে তিনি ছাত্রছাত্রীদের জুজুৎসু শিক্ষায় উৎসাহিত করতে পারেননি। এমনকি কলকাতার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে জুজুৎসুর প্রদর্শনী করেছিলেন তাকাগাকি ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি গান বাঁধলেন: "সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।.."

দু'বছর পরে তাকাগাকি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় জুজুৎসু শিক্ষার পাঠ উঠে যায়। তাকাগাকি এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে জুজুৎসু শিক্ষা দেন।

তান-ইউন-শান [(Tan Yun-Shan (১৮৯৮-১৯৮৩)]

Tan Yun-Shan শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২৮-এ এবং বিশ্বভারতীর চীনা-সংস্কৃতির (Sinology) অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। মাত্র পাঁচ জন ছাত্র নিয়ে তিনি চীনা ভাষা শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি নিজেও সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন। একাধারে শিক্ষক ও ছাত্র। শান্তিনিকেতনের শিক্ষকমন্ডলীর সঙ্গে তাঁর সাংস্কৃতিক আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদান প্রায়শই চলতো। তিনি নিজে চীনা সংস্কৃতির একজন বিশিষ্ট পন্ডিত ছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই শান্তিনিকেতনে গড়ে ওঠে এশিয়ার প্রাচীনতম চীনা ভবন। তিনি সারা জীবন চীনা-ভারত (Sino-Indian) সংস্কৃতি ও বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধন তৈরী করতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

জ্যুলা গ্যারমানুশ - Gyula or Julius Germanus (১৮৮৪-১৯৭৯)

প্রাচ্যবিদ, ইসলাম ধর্ম এবং দর্শনের সুবিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান পন্ডিত। জন্ম ও শিক্ষা বুদাপেস্টে। হাঙ্গেরিয়ান ভাষা ছাড়া আরবি, তুর্কি আর উর্দু ভাষায় দক্ষ। বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটিতে তুর্কি ও আরবি ভাষা এবং সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৯২৯ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৩২-এর মার্চ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে ইসলাম ধর্ম-দর্শন এবং সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৬ সালে তৎকালীন হাঙ্গেরিয়ান পেন ক্লাবের সেক্রেটারি জুলিয়াস গ্যারমানুশ (জ্যুলা) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এক সাক্ষাৎকার হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন ব্যালাটোন ফুরেদ (ব্যালাটোন লেক)-এর বিশ্ববিখ্যাত হার্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁদের এই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় রবীন্দ্রনাথ জ্যুলা গ্যারমানুশকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানান। জ্যুলা গ্যারমানুশ জীবনের শেষ পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

পিয়েত্রো গুয়াডাগনি - ইতালীয় ভাষার প্রফেসর। সুবক্তা, সাহসী ব্যক্তিত্ব। গোঁড়া রাষ্ট্রবাদী এবং মুসোলিনির একনিষ্ঠ সমর্থক, এমনকি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্ক করার সাহস রাখতেন। অধ্যাপক সমাজে জনপ্রিয় ছিলেন। নীতিগত মতভেদের কারণে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান (১৯২৯)।

রেভারেন্ড লিন্ডসে - শান্তিনিকেতনের ইংরেজির প্রফেসর - গাঁধীবাদী, আমেরিকান মেথডিস্ট চার্চের মিশনারি ছিলেন। ওই সময় (১৯২৯-৩০)। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে থাকতেন। ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং গাঁধীজির সহযোগীও ছিলেন।

আলেক্স আরোনসন - Alex Aronson (১৯১২ — ১৯৯৫) - আলেক্স ছিলেন একজন জার্মান লেখক ও শিক্ষক। হিটলারের ইহুদি-নিধন যজ্ঞ থেকে রক্ষা পেতে তিনি ১৯৩৭ সালে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। বিশ্বভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের তিনি ইংরাজি পড়াতেন। এছাড়া বিশ্বভারতীর বিভিন্ন পত্র পত্রিকা প্রকাশনায় সাহায্য করেছেন। লেখক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর লেখা একটি বই (Rabindranath Through Western Eyes) বেশ বিখ্যাত হয়। বইটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় (১৯৪৩)। ২০০০ সালে বিশ্বভারতীর প্রকাশনায় Dear Mr. Tagore, (95 Letters Written to Rabindranath Tagore from Europe and America)) আলেক্স আরোনসনের অনেক অবদান আছে।

শ্রীধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির: রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) থেকে শ্রীধর্মাধার রাজগুরু শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধদর্শন শিক্ষাদান ও গবেষণা করেন। বিশ্বভারতীর শুরুর কালে (১৯২০) বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীধর্মাধার রাজগুরু পালি, অ্যাড্রুজ ইংরেজি এবং নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রকলা শিক্ষা দেবেন বলে ঠিক হয়। ১৯২০ সালের ২রা মে শ্রীধর্মাধার রাজগুরু হিন্দি ভাষায় বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর অধীনে মহাযান বৌদ্ধপূরণের অনুশীলনের মাধ্যমে ভারত-ইতিহাসের একটি অচর্চিত অধ্যায় সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের আহ্বান করেন।

মর্গ্যানস্টিয়ের্নে [Georg Morgenstierne (1892 – 1978)] : মর্গ্যানস্টিয়ের্নের নাম আমরা মুজতবা আলীর লেখাতে ('রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়' - বড়বাবু) পাই। ইনি নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের প্রফেসর ছিলেন। তাঁর ভাষা বিষয়ক গবেষণার কাজে তিনি আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান ও ভারতবর্ষে আসেন। ১৯২৩-এ (?) মর্গ্যানস্টিয়ের্নে শান্তিনিকেতন আসেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহু ঘন্টা, বহু দিনব্যাপী ভারতীয় তথা পাশ্চাত্য

সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনিও বোধহয় (?) শান্তিনিকেতনে ভাষাতত্ত্বের ক্লাস নিয়েছেন।

গেরট্রড রুডিগ্যার - এক জার্মান তরুণী, জার্মান বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও পর্বতরোহী। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মে শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি কিছুদিন ছাত্রছাত্রীদের জার্মান ভাষা শিক্ষা দেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ডাঃ টিম্বার্সের হাসপাতালে (শান্তিনিকেতনে) কাজ করতেন। তাঁর চরিত্র জার্মান অনুশাসন, যুক্তির দৃঢ়তা আর শারীরিক ক্ষমতার প্রতিরূপ ছিল।

মিস ক্রিস্তিন বসনেক - মিস ক্রিস্তিন বসনেক ছিলেন ফরাসি স্কুল শিক্ষিকা। তিনি ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে বিশ্বভারতীর ছাত্রীনিবাস শ্রীভবনে প্রনেত্রী রূপে যোগ দেন। আল্যাঁ দানিয়েলু ও বেনোয়ার সূত্রেই তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। সেই অর্থে তিনি রবীন্দ্রসূত্রে না হলেও তিনি রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁকে প্রায় পাঁচ বছর ফরাসি ক্লাসে শিক্ষিকা হিসেবে পাওয়া যায়। তিনি ১৯৪০-এ বিশ্বভারতী ত্যাগ করেন। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি রবীন্দ্র-রচনা ফরাসিতে অনুবাদের কাজে মন দিয়েছিলেন।

তথ্য সংগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. রবিজীবনী (পঞ্চম - নবম খন্ড) - প্রশান্তকুমার পাল । প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স।

২. সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (প্রথম খন্ড - ময়ূরকণ্ঠী ('আচার্য তুচ্ছি', 'বিশ্বভারতী' ইত্যাদি রচনা)) - প্রকাশক: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

৩. রবীন্দ্রনাথ ও ফ্রান্স - সৈয়দ কওসর জামাল। প্রকাশক: আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৪. বিশ্বহৃদয় পারাবারে (মোরিৎস ভিন্টারনিৎস) - দেবব্রত চক্রবর্তী । প্রকাশক: সিগনেট প্রেস।

৫. রবীন্দ্রজীবনকথা - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স।

৬. Rabindranath Tagore – A Biography by Krishna Kripalani, Publishers: UBS Publishers' Distributers Pvt. Ltd.

৭. অগ্নিযুগে শান্তিনিকেতনে হাঙ্গেরীয় দম্পতির স্মৃতিলিপি - জি রোজা হাইনোসি (বাংলায় অনুবাদ - বিচিত্রা ভট্টাচার্য)

৮. গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ - সমীর সেনগুপ্ত। প্রকাশক : প্যাপিরাস ।

9. Internet / Wikipedia

জঙ্গলের অনুশাসন

Subrata Mazumder | 1967 CE

ভুত আছে কি নেই, এই নিয়ে তর্কের শেষ নেই। ভয় থেকেই যদি ভুতের জন্ম হয় তা হলে ভুত থেকেই বা ভয়ের জন্ম হবে না কেন? ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েও এই ধরণের তর্ক আদিম জুগ থেকে চলে আসছে, দুটো তর্কেরই আজও কোনও রকম নিস্পত্তি হয় নি। আর হবে কিনা বলাও যায় না।

বিজ্ঞানের যুগে কেউ এসব মানতে চাইবে না এবং এটা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপারও নয়।

অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যদি কোন কিছু দেখা না যায় তা হলে তার অস্তিত্ব কিছুতেই সম্ভব নয়। এটাই বাস্তব, এটাই সত্যি।

ভুতের কথা আমিও বিশ্বাস করতাম না। অনেক জায়গা থেকে ভুত দেখার জন্য আমন্ত্রণও এসেছে। পোড় বাড়ীতে রাত কাটিয়েছি, ঘোর অমাবস্যায় শ্মশানে ঘুরেছি, ভুত আছে এরকম নির্জন রাস্তায় একা ঘুরেছি। কিন্তু চামচিকে, ইঁদুর, সাপ, শেয়াল ছাড়া আর কিছু নজরে আসে নি।

ভুত সমন্ধে ঘোরতর অবিশ্বাসি হয়ে উঠেছিলাম, এমন সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা আমার জীবনে না ঘটলেই বোধ হয় ভাল ছিল। সেই ঘটনার কথাই আজকের গল্প। অবশ্য এটাকে গল্প না

বলে ঘটনাই বলা উচিৎ কারণ এটা ঘটেছিল, আর ঘটেছিল বলতে গেলে আমার চোখের সামনেই। তা হলে শুরু করা যাক।

বাইরের হিমেল ঠাণ্ডা হাওয়া ভিতরে ঢোকার আপ্রান চেষ্টা করছিল, কিন্তু কাঁচটা বন্ধ থাকায় ঢুকতে পারছিল না। আমি সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা রাস্তা ধরে সন্তর্পণে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, আমার নিস্বাস প্রশ্বাসের জন্য গাড়ির সামনের কাঁচটা ধোঁয়াটে হয়ে যাওয়াতে দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল।

অবিরাম তুষারপাত অব্যাহত ছিল, অনুর্বর ভূদৃশ্যে একটি ভয়ংকর শিখাহীন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তারা একটা একটা করে পড়ছিল সাদা পালকের মত হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে। সমস্ত পৃথিবীটাকে অদৃশ্য কোন শক্তি যেন একটা শ্বেতশুভ্র চাদরে মুড়ে দিয়ে দূর থেকে লক্ষ্য করছিল কেমন লাগে দেখতে। কি অপরূপ সেই দৃশ্য। নৈসর্গিক ওই দৃশ্য অন্য সময় হলে আমিও উপভোগ করতাম। কিন্তু এই দৃশ্য যেমনই নৈসর্গিক তেমনই ভয়ঙ্কর। আমার স্টিয়ারিং হুইলটাকে সাঁড়াশির মত চেপে ধরলাম, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করছিলাম প্রানপনে। এদিক থেকে ওদিক হলে রক্ষে নেই, একেবারে সোজা নিচের খাদে পড়ে যাবে গাড়ি, মৃত্যু অবধারিত । হৃদপিণ্ড এত জোরে ওঠানামা করছিল, মনে হল বোধ হয় ফেটে বেরিয়ে আসবে।

আমার ইন্দ্রিয়গুলি এমনিতেই উচ্চ সতর্কতায় ছিল, তবে প্রায় শূন্য দৃষ্টিগোচরতা সব কিছু দেখতে কঠিন করে তুলছিল। হঠাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্মরণ করিয়ে দিল নীচের খাদে ছায়াময় একটা কিছু নড়াচড়া করছে। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি তেরছা চোখে সেই দিকে আবার তাকালাম, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

দেখলাম আমার বন্ধু আলি শিকারের পোশাক পরে ঘোরাফেরা করছে , খাদের নিচে সমতল জায়গায়। কাঁধে তীর ধনুকের সরঞ্জাম। কিন্তু আলি এখানে এই সময়ে কি করছে? হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে এটা হরিণ শিকারের মরসুম। এই সময়টা হরিণদের সঙ্গমের সময় আর শিকারিদের শিকারের সময়। আমি জানতাম আলি খুব বড় ধরনের শিকারি। আমি গাড়ির স্পীড কমিয়ে হাত নাড়লাম, কিন্তু আলি উত্তর দিল না। আমি সাবধানে ধোঁয়াটে জানলার কাঁচটা পরিষ্কার করার জন্য চেষ্টা করছিলাম, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আমার হৃদস্পন্দন থেমে গেল। আমি না গত সপ্তাহে আলির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগদান করে ছিলাম? তবে কি... ।?

আচ্ছা এমন কখন হয়েছে যে আপনি একজনের সঙ্গে আগের দিন কথা বলেছেন আনেক্ষন ধরে আর তার পরের দিন শুনলেন যে সে মারা গেছে। এটা যে কি অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা বোঝানো যাবে না। আমার ঠিক তাই হয়েছিল। লোকটির নাম ছিল আলি। মিডিল ইস্টের কোন একটা দেশ থেকে এসেছিল অ্যামেরিকায়, আমারই মত ভাগ্যের সন্ধানে। আলি বয়সে আমার থেকে একটু ছোটোই হবে। দেখতে সুন্দর, লম্বা, চালাক চতুর ও চটপটে। অল্প দিনের মধ্যেই অফিসের সবাইকার সাথে বেশ ভাবসাব করে নিয়েছিল। আলির বউয়ের নাম নর্মা, সাদা অ্যামেরিকান মেয়ে। কলেজ থেকেই আলাপ দুজনের। তারপর প্রেম তারপর বিয়ে। ওদের একটি ছেলে, তিন বছর বয়স, নাম জন। নর্মার দ্বিতীয় সন্তানের প্রেগনেনন্সি খুব এডভ্যান্স ষ্টেজে। আমি মাঝে মাঝে গেছি ওদের বাড়িতে। ওদের বাড়িটা এমনিতেই খুব সুন্দর, আর নর্মার ফেঙ সুইর ছোঁয়াচ লেগে সেটাকে মনে হত যেন মডেল হোম।

আলির সঙ্গে কথা হচ্ছিল ব্রেক রুমে, সকালবেলা কফি খেতে খেতে। ও বলছিল উইক এন্ডে ও আর ওর আরেক বন্ধু মিলে গিয়েছিল "ডিয়ার হান্টিং" করতে। খুব গর্ব করে বলছিল যে ও একটা খুব বড়সড় হরিণ মেরেছে। আলি আবার বন্দুক ব্যবহার করে না। তীর আর ধনুক দিয়ে শিকার করে। ওর ধারনা তাতে নাকি পশুকে একটু সুবিধা দেওয়া হয়। ওর আরও ধারনা তাতে বীরত্বও একটু বেশি অর্জন করা যায়। আলি খুবই গর্ব করে বলছিল যে যদিও দিনটা ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল, ও শুধু শব্দের ওপর ভরসা করে যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেইদিক লক্ষ্য করে তীরটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। হরিণটা সেই একটা তীরেই ঘায়েল হয়েছিল। আলি যখন আধ্মরা হরিণটার কাছে গেল, দেখল তীরটা কোমরের কাছ দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। হরিণটা মাটিতে শুয়ে ছটফট করছে, তার শরীরের রক্তে মাটিটা লাল হয়ে গেছে। দেখল অদুরে দাঁড়িয়ে আছে ওর সঙ্গিনী হরিণীটি, দেখে মনে হল গর্ভবতী, বাচ্চা হবে যে কোনদিন। আরও দেখল একটা বাচ্চা হরিণ তার মার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে , কি করবে বুঝতে পারছে না। আলি বলল যে দয়া পরবশ হয়ে ওই দুটোকে আর মারেনি। আলির কথা শুনে গাটা কিরম যেন ঘিনঘিন করে উঠল, আর কিছু শুনতে ইচ্ছে করল না। খুব জানতে ইচ্ছে করছিল আধ্মরা হরিণটির কি হল। আলি কি আর একটা তীর ছুড়ে তার প্রাণটা বের করে দিল? না ছুরি দিয়ে তার গলাটা কেটে দিল? প্রায় মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিয়ে একটা জরুরী কাজের বাহানা করে ওখান থেকে সরে পড়লাম।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসে বসে ভাবছিলাম আচ্ছা ওই মেয়ে হরিণীটির কি হবে? আর বাচ্চা হরিণটাই বা কি করবে? মনকে বোঝালাম ওরা তো জঙ্গলেই থাকে, ওরকম হয়েই থাকে। তীর লেগে না মরলে ওকে হয়ত হায়নায় খাবে বা অন্য কিছু হবে। সারভাইব্যাল অফ দা ফিটেষ্ট এর দোহাই দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। কাজে মন বসাতে পারলাম না। আফিস ছুটি হওয়াতে মনে হল বেঁচে গেলাম। কিছু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। পরের দিন কি ঘটে ছিল সেটা শুনলেই বুঝতে পারবেন। আমার অফিস বাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। ভোর পাঁচটায় উঠতে হয়, ছটার মধ্যে আমাদের গাড়ি হাইওয়ে ধরে অফিসের দিকে ছুটতে থাকে। আমাদের বলছি এই কারনে যে সাধারনত আমরা কারপুল করে যাতায়াত করে থাকি। কিন্তু যে দিনটার কথা বলছি অর্থাৎ আলির সঙ্গে কথা বলার পরের দিন আমার একটা ভোর বেলায় জরুরী মিটিং থাকার জন্য ওইদিন আমাকে একাই গাড়ি চালাতে হয়েছিল। গাড়ি কিছুটা দূর যাওয়ার পরই বৃষ্টি শুরু হল। গাড়ির রেডিওটা অন করাতে শুনতে পেলাম যে প্রবল বর্ষণ ও ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালানোর সাবধান বানীও শুনলাম। কিছুটা যাওয়ার পর বৃষ্টির তেজটা আরও বাড়ল, তার সঙ্গে কুয়াশার ঘনত্ব। সামনেটা ভালো দেখতে না পাওয়ার জন্য গাড়িটা আস্তেই চালাচ্ছিলাম। মনে মনে ভাবলাম ভালই হয়েছে একটু আগে বেরিয়ে। প্রায় চল্লিশ মাইল যাওয়ার পর একটা একজিট নিতে হয়। পার হতে হয় একটা খুব ছোট শহর । এই ছোট শহরটা পার হওয়ার পর যে স্টপ সাইনটা পড়ে সেখান থেকে আমাদের অফিসে পৌঁছোতে বাকি থাকে আর নয় মাইল। আমেরিকার যে কোন ছোট শহরের মতই এই শহরটা।

আজ এই ছোট শহরটার ওপর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, শহরটাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছিল। শহরটা ঘুমিয়েই থাকে আমরা যখন যাই ওর ওপর দিয়ে। ল্যাম্পপোস্টের টিম টিমে আবছা আলোয় আজ কেমন যেন মনে হচ্ছিল নিঝুমপুরী। আশেপাশের বড় বড় বাড়ির ছায়াগুলো যেন

মনে হচ্ছিল আমার গাড়ির পেছন পেছনে আসছে। কাছেই কথাও বিরাট আওয়াজ করে একটা বাজ পড়ল। আকাশটাকে দু ফাঁক করে এক ঝলক আলো দেখিয়ে আবার গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে দিল। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। মনে হচ্ছিল একটা ভৌতিক পরিবেশ যেন শহরটাকে ঘিরে রেখেছে।

ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে গাড়িটাকে সাবধানে চালিয়ে কখন যে ছোট শহরটা পার হলাম মনে নেই। হঠাৎ দেখি স্টপ সাইনটার কাছে এসে গেছি। স্টপ সাইনটার পরে যে রাস্তাটা পড়ে সেটা আরও খারাপ, তার দুদিকে খাদ। নজর শুধু রাস্তাতে রাখলেই হবে না, চোখ রাখতে হবে সামনে যেন কোন জন্তু জানোয়ার এসে না পড়ে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতের হোক বা যে কোন কারনেই হোক আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলো খুব সজাগ হয়ে উঠল। সেইজন্যেই কিনা জানিনা মনে হল বেশ কিছুটা দূরে কিছু একটা ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কিছু বুঝতে বা দেখতে পেলাম না। আমার ইন্দ্রিয় নিজের থেকেই সজাগ হয়ে উঠল, গাড়ির স্পিডটাকেও কমালাম। হঠাৎ আমার সামনে থেকে কে যেন ঘন কুয়াশার পর্দাটা সরিয়ে নিল। বৃষ্টিটাও মনে হল অনেকটা ধরে গেছে। আমি আবার সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। সুন্দর পরিষ্কার একটা দিন, যেন কিছুই হয় নি। মনে হল প্রকৃতি আমার সঙ্গে রসিকতা করছিল এতক্ষণ। আর একটু এগোনোর পরেই ঘটনাটা চোখে পড়ল। যার কথা আমি জন্মজমান্তরেও ভুলতে পারব না।

একটা ছোট নীল রঙের গাড়ি রাস্তা থেকে গড়িয়ে গিয়ে পাশের খাদে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। অন্তত দশ ফুট নিচে তো হবেই। আর একটা সবুজ রঙের মাঝারি সাইজের গাড়ি রাস্তার ধারে পার্ক করা। আরও লক্ষ্য করলাম রাস্তায় গাড়ি স্কিড করলে যে রকম দাগ হয় ওইরকমের গভীর দাগ। দাগটা সোজা নেমে গেছে যেখানে গাড়িটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে সেই অবধি। রাস্তার ধারের রেলিঙটার অর্ধেকটা ভাঙ্গা। দূর থেকে বুঝতে পারলাম না গাড়িটার ভিতরে ড্রাইভার আছে না নেই। একটু এগিয়ে গিয়ে আমার গাড়িটা পার্ক করলাম। গাড়ির থেকে নেমে দেখলাম একটা লোক প্রাণপণ চেষ্টা করছে কাৎ হয়ে পড়ে যাওয়া গাড়িটার ভেতর থেকে ড্রাইভারকে বের করার। চোখটা গিয়ে পড়ল ড্রাইভার এর ওপর। চমকে উঠলাম, আরে এ তো আমাদের আলি। গোঙাচ্ছে, কাৎরাচ্ছে, আসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। যে লোকটা আলিকে সাহায্য করছিল এতক্ষণে তার ওপর আমার চোখ পড়ল। চিনতে পারলাম, আমাদের অফিসেই কাজ করে, নাম গ্রেগ। আমায় বলল, প্রায় দশ মিনিট ধরে আলিকে বের করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। আমায় বলল পুলিশে আর এম্বুলেন্সে খবর দিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কথামত আমার সেল ফোন থেকে কল করে দিলাম। মিনিট দশেকের মধ্যে পুলিশ আর এম্বুলেন্স চলে এল। আমি দেখলাম আমার আর কিছু করার নেই, তাছাড়া মিটিং এরও দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আমি গ্রেগের কাছে বিদায় নিয়ে অফিসে চলে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। ঘনঘন আমার কাছে ফোন আর লোকজন আসতে শুরু করল, খবর নেওয়ার জন্য। খবর এল যে দরজা কেটে আলিকে গাড়ি থেকে বের করতে হয়েছে। হেলিকপ্টারে করে আলিকে কাছের বড় শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বেলা চারটের সময় খবর এল অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আলিকে বাঁচান যায় নি।

প্রায় দুদিন পরে আলির ফিউনারালের খবর পেলাম অফিসের ইমেলে। অফিসের অনেকেই গেল ফিউনারালে, আমিও গেলাম। সকাল দশটায় চার্চে হাজির হওয়ার কথা। গাড়ি পার্ক করে চার্চে ঢোকার মুখে দেখা গ্রেগের সঙ্গে। সেই গ্রেগ যাকে দেখেছিলাম এক্সিডেন্টে ঠিক পরেই, আলিকে যে গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বের করার চেষ্টা করছিল। গ্রেগ বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। আমাকে দেখে একটু অপেক্ষা করতে বলল। একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল "তোমাকে একটা কথা বলার ছিল, কাউকে বলবে না কথা দাও তো বলব।"

আমি একটু অবাক হলাম, সাধারনত আমেরিকানরা এরকম ভাবে কথা বলে না।

যাই হোক ওকে আশ্বাস দিলাম যে বলব না।

গ্রেগ বলতে শুরু করল "এক্সিডেন্টটা যদিও আমি দেখিনি কিন্তু মনে হয় পৌঁছেছিলাম মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। গাড়টা পার্ক করে যখন আলির কাছে নামলাম, তখনও আলির জ্ঞান ছিল, কথা বলছিল। আলি আমাকে বলেছিল কি ঘটেছিল।

একটু দম নিয়ে সিগারেটে একটা টান দিয়ে গ্রেগ বলল "আলি নিজের মনে গাড়ি চালাচ্ছিল, হঠাৎ দেখে সামনে একটা বেশ বড়সড় হরিণ তার রাস্তাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখল হরিণটার কোমরের কাছে একটা তীর এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে, অথচ হরিণটা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে না। রক্তও বেরোচ্ছে না। হরিণটা শুধু তাকিয়ে আছে আলির দিকে। কি বিভৎস সেই চাহনি। আলির শরীরে যত রক্ত ছিল মনে হল যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঠিক এর পরেই আলি একটা বিরাট জোরে পাশবিক চিৎকার শুনতে পেল। আওয়াজটা এতোই জোরে যে আলির মনে হল তার কানের পর্দাটাই বুঝি ফেটে যাবে। আলিকে স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিয়ে দুটো হাত দিয়ে কানটাকে ঢাকতে হল। আলির মাথাটা ঘুরতে লাগল বনবন করে। আওয়াজটা কিছতেই বন্ধ হচ্ছে না। হঠাৎ আওয়াজটা যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি বন্ধ হয়ে গেল। আবার একটা বিরাট জোরে আওয়াজ হল কোথাও। যেন ভারি কিছু একটা পড়ার আওয়াজ। ভয়ে ভয়ে যখন চোখ খুলল, দেখল ওর গাড়িটা খাদের মধ্যে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। প্রথমেই ওর চোখটা গেল রাস্তার অপর, দেখল হরিণটা নেই। অবাক হল আলি। একটা তীরবিদ্ধ হরিণ কোথায় যেতে পারে? গাড়ির থেকে বেরতে চেষ্টা করল, কিছুতেই পারল না। মনে হল কোমরের নিচের দিকটা অবশ হয়ে আসছে। পা দুটো বশে নেই। কি হল কিছুই বুঝতে পারল না। কথাগুলো বলতে বলতেই আলি ক্রমশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ঠিক এই সময়ে তুমি ঘটনাস্থলে এসেছ। এরপরের সব ঘটনাই তোমার জানা।

সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ফেলে দেবার আগে গ্রেগ বলল "আলির গাড়িটা খাদে পড়ার আগেই রাস্তার ধারের রেলিংটায় জোরে ধাক্কা মারে, রেলিংটা ভেঙ্গে যায়। আর সেই ভাঙ্গা রেলিংটা সোজা ড্রাইভারের দিকের দরজা ভেদ করে আলির শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়। রেলিংটা আলির কোমরটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। আলির নিচের দিকটা যে অবশ হয়ে গিয়েছিল সেটা ওই কারনেই। পুলিশ আর এম্বুলেন্সের লোকেরা যখন দরজা কেটে আলিকে বের করে তখনই এসব জানা জায়।"

গ্রেগের কথা শেষ হওয়ার পর আমরা দুজনেই চার্চের ভিতরে ঢুকলাম। একটা সুন্দর গন্ধ জায়গাটায় ছড়িয়ে আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশ, ডান দিক থেকে দেখলাম অর্গানের আওয়াজ আসছে কিন্তু কোন বাদককে বাজাতে দেখলাম না। আলির বন্ধুবান্ধব, আত্মিয়সজন সবাই এক এক করে ওর সমন্ধে ভাল ভাল কথা বলছে। সামনের সারিতে আলির বউ নর্মা বসে আছে, খুব কাঁদছে। খুব এডভান্স প্রেগনেন্সি নর্মার, যে কোনদিন বাচ্চা হবে। আলির ছোট ছেলেটা অবাক চোখে তার মার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে, কি করবে বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ আলির সেই হরিণ শিকারের কথাটা মনে পড়ে গেল। মনটা চলে গেল সেই জঙ্গলে। মনে পড়ে গেল সেই হরিণটার কথল, সেই হরিণীটির কথা। কোথায় যেন একটা ভীষণ মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম সমস্ত ঘটনাটার মধ্যে। কত কথা মনে হচ্ছিল। সেই হরিণটাই কি সত্যি এসেছিল, না ওটা আলির মনের ভুল।

কানে এল এক ভদ্রমহিলা আর একজনকে বলছেন "ভগবানের এ কি অন্যায়, একজন স্বামিকে এত অল্প বয়সে তার স্ত্রীর এর কাছ থেকে কেড়ে নিল?

আমার আর সহ্য হল না। উত্তরের অপেক্ষা না করে, কাউকে কিছু না বলে আমি আস্তে চেয়ার থেকে উঠে, কাউকে বিরক্ত না করে চার্চ থেকে বেরিয়ে এলাম।

দুর্গাপুজো আমেরিকান কায়দায়

Subrata Mazumder | 1967 CE

মনে পড়ে ছেলেবেলায় নতুন বছর শুরু হওয়ার প্রথম থেকেই বসে থাকতাম দুর্গা পুজার জন্য। মাকে জিজ্ঞাসা করতাম পুজোর আর কতদিন বাকি | মা বলতো পঞ্জিকা এখনও বেরোইনি, বেরোলে জনাব | পঞ্জিকা বেরোলে মা ক্যালেনডারে দাগ দিয়ে বলতো, এই দেখো এই পাঁচ দিন পুজো। ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো তখন মনে হত বড্ড দেরি করছে, দিনগুলোতে পৌছতে | আমার শৈশবের কলকাতায় কাটানো প্রতিবছরের পুজোর ওই কটাদিন আজও মনে পড়ে ছবির মত। লক্ষের থেকে উপলক্ষ্য বড় হয়ে উঠত আমার কাছে | নতুন কেনা জামা কাপড় আর বাটার জুতো বড় হয়ে উঠত পুজোর থেকে অনেক বেশি হয়ে | মনে পড়ে পুজোর এক সপ্তাহ আগে ভোর বেলায় মায়ের ডাকে ঘুম থেকে উঠে বীরেন ভদ্রের গলায় মহালয়ার কথা | আমার পুজো শুরু হত বলতে গেলে ওই মহালয়ার গান শোনার পরের দিন থেকেই |

পুজোর সময়ে কলকাতা মনে হত একটা আসতো পাগলখানা | সারা শহরটা মেতে উঠত ঔই পাঁচটা দিন, ঝলমল করতো আলোয় আলোয়, ঢাকের বাদ্যি আর লাউড স্পিকারের কান ফাটানো হিন্দি সিনেমার গানে | ছোট থেকে বড় সবাইকে দেখতাম পাটভাঙ্গা নতুন জামা কাপড় পরে দলে দলে ঘুরছে পাড়ায় পাড়ায় ঠাকুর দেখার জন্য | কত রকমেরই না ঠাকুর, কত বড় আর কত রকম তাদের সাজ। সব প্রতিমার মুখেই আমি লক্ষ্য করতাম অদ্ভুত একটা হাসি। পান্ডেল থেকে পান্ডেল আমিও ঘুরে বেড়াতাম বন্ধুদের সঙ্গে। মনে হত এই প্রতিমাটা আগের দেখা প্রতিমাটার থেকে আরো ভালো , হাসিটা আরো সুন্দর। পাঁচটা দিন মনে হত বড্ড কম , আরও বেশিদিন ধরে পুজো চলা উচিত | ঠিক করেছিলাম বড় হয়ে সব পাল্টে দেবো। অঞ্জলি দেবার সময় পুরোহিতের পড়া মন্ত্রগুলো আমার কানে বাজত। সমস্ত পরিবেশটা মনে হত সুন্দর, নির্মল , পবিত্র আর জাগ্রত |

সে বেশ অনেক দিন আগের কথা। আমেরিকার একটি শহরে দুর্গাপুজো দেখতে গিয়েছিলাম | স্কুলের অডিটোরিয়ামে ঢুকে চাঁদা দিয়ে, থুড়ি প্রনামী দিয়ে বসলাম একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে | দেখলাম আমার চেনা এক ডাক্তার বন্ধু পূজো করছেন। একটু অবাক হলাম। পাশে বসা ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম নিচু স্বরে "আচ্ছা যিনি পুজো করছেন উনি তো ব্রাহ্মণ নন। উনি পুজো করছেন কি করে? তাছাড়া উনি যদিও দেখে পড়ছেন কিন্তু সংস্কৃতের মন্ত্রগুলো ঠিক মত উচ্চারণও করছেন না। "

ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন আমার ওপর " তার মানে , পুরোহিত ব্রাহ্মণ হতে হবে এমন কথা কোথাও লেখা আছে, আপনি দেখাতে পারবেন? কতদিন আমেরিকায় আছেন? এখনও এত ব্যাক ডেডেট হয়ে আছেন কেন বলুন তো ? এবারে নন ব্রাহ্মণ দিয়ে পুজো করলাম, পরের বারে দেখবেন মহিলা পুরোহিতকে দিয়ে পুজো করাব।

অনেকদিন ধরে এইসব Discrimination চলে আসছে, আমরা ঠিক করেছি আর আমরা এসব আর সহ্য করব না। আপনাদের মত লোকেদের জন্যেই আজ বাঙালিদের এত অবনতি। আর সংস্কৃতের মন্ত্রগুলো ঠিক মত বলছেন না, এটাই বা আপনি জানলেন কি করে? আপনার কি সংস্কৃতে পিয়েজডি আছে? আর তাছাড়া ভুল যদি উনি বলেও থাকেন তাতে কি হয়েছে? ওটা এমনিতেও একটা অবসলিট লাঙ্গওয়েজ। আমরা ঠিক করেছি এবার থেকে আমাদের বাচ্চারা যাতে বুঝতে পারে তাই ওই মন্ত্রগুলো ইংলিশে ট্রান্সলেট করে ওদের দিয়েই পড়াব। "

আমি আড়চোখে এদিক ওদিক তাকালাম কেউ আমাদের কথা শুনছে কিনা | দেখলাম অনেকেই মা দুর্গার দিকে না তাকিয়া আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে | আমি ওনাকে বলতে পারলাম না যে আমি চিরকাল মাঝারি স্টুডেন্ট, জীবনে কখন ফার্স্ট হই নি, বাঙালিদের অবনতির জন্য আমার দায়িত্ব খুবই কম, প্রায় নেই বললেই চলে। আমি ওনাকে এটাও বলতে পারলাম না যে স্কুল থেকে কলেজে ওঠার পরীক্ষায় সংস্কৃতে লেটার পেয়ে ছিলাম। আমার বাবা সংস্কৃতের মাস্টার মশাই ছিলেন। বাবা ভোরে নিজে উঠে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে পুজোর মন্ত্র পড়াতেন। ভুল উচ্ছারন করলে আমায় কানমলা খেতে হত। মনে হোল আর ওনার পাশে আর কিছুক্ষণ থাকলে উনি হয়তো আমার গায়ে হাত তুলতে পারেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মানে মানে কেটে পড়লাম ওখান থেকে।

অনেকটা দুরে একটা ফাঁকা চেয়ারে বসে পড়লাম। চোখটা সরাসরি গিয়া পড়ল মাদুর্গার ওপর |মাদুর্গা দশভূজা হয়ে পায়ের নিচে পড়ে থাকা অসুর নিধনে ব্যস্ত | তাঁর ছেলে আর মেয়েরা যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সব ঠিকঠাক | এক মিনিটের জন্য চোখটা বন্ধ করলাম -আমার মনটা দৌড়াতে শুরু করল, চলে গেল কলকাতায় | আমার সেই ছোটবেলার কলকাতায়, সেই পুজোর দিনগুলোতে –মাত্র এক মিনিটের জন্য | চোখটা আবার খুললাম –আরে এই প্রতিমাটা এত ছোট কেন? বাঃ ছোট তো হবেই, কুমুর্তুলির থেকে আনতে খরচ পড়ে না? মনে আছে আমি একবার কথাটা তুলে ছিলাম | আমায় বলা হয়েছিল –যত বড় প্রতিমা তত খরচ। ফেল কড়ি মাখো তেল | পয়সা ছাড়ুন আপনাকে চল্লিশ ফুট লম্বা প্রতিমা এনে দেব | মনে আছে কলকাতায় পুজো শেষ হলে প্রতিমার বিসর্জন হোত। ঘরে ঘরে বাড়ির বাইরে মাটির প্রদীপ জালানো হতো। মাটির প্রতিমা জলে ফেলে দেওয়া হতো। মা গঙ্গা তাঁর বুকে টেনে নিতেন সবাইকে। ঢাকের বাজনা এত

জোরে বাজতো যে সারা বাড়ি কেঁপে উঠত | আমার বুকের ভেতরটাও কেঁপে উঠত কিন্তু বাজনার আওয়াজের জন্য নয় শুধু মা দূর্গা চলে যাবেন বলে| আমরা কলাপাতায় লিখতাম ঠাকুর আবার এসো | ঠিক এই সময়টাতে আমার দুচোখ জলে ভরে উঠত | জানতাম পরের বারের ঠাকুর হবে সম্পূর্ণ নতুন | মায়ের হাসি পরের বার কেমন হবে দেখার জন্য আমি অপেক্ষায় থাকতাম|

মনটা খারাপ হয়ে গেল আমেরিকান দুর্গাপুজোর কথা ভেবে| আমেরিকায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার দরকার হয় না| তিনি আসেন আর চলে যান প্যাকেজ ডিল হোয়ে| একবছরের জন্য তিনি বন্দিনী হয়ে থাকবেন | স্টেট অফ দা আর্ট টেকনলোজির সাহায্যে তাঁকে এমন ভাবে রাখা হবে যাতে আলো আর বাতাস ঢুকে তাঁর চেহারার কোন পরিবর্তন না করতে পারে | আচ্ছা মায়ের কি ইচ্ছে করে না নতুন চেহারা নিয়ে নতুন হাসি নিয়ে দেখা দিতে ? আমি মাকে বলি " কিছু চিন্তা করো না মা| কুছ পরোয়া নেই | আমরা এখান থেকে একটা মাউসের ক্লিকে দেশের যে কোন জায়গায় বিজয়ার মিষ্টি নিমেষের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পারি| পাঠাতে পারি ই-মেল করে খুব সুন্দর দেখতে বিজয়ার কার্ড, ঢাকের আওয়াজ সমেত, যার সঙ্গে থাকবে অবিকল প্রদীপের মত দেখতে ছবি | তুমি বুঝতেই পারবে না আসল না নকল| আর হাসির কথা ভাবছ ? ওটা কোনো ব্যাপারই না | ওটা হলো সম্পূর্ণ মাইন্ড সেটের ব্যাপার| মাইন্ড সেটটা তোমায় একটু বদলাতে হবে| এই ধরনা লীয়নার্দোর আঁকা মোনালিসার

হাসি | গত প্রায় পাঁচশ বছর ধরে লোকের মন জয় করে আসছে কি না ? তোমায় আর কি বলব তুমি তো সবই জানো| একই হাসি অথচ যত দিন যাচ্ছে ততোই লোকের ভালো লাগছে | তোমার হাসি মোনালিসার হাসির থেকে কম নয় বরঞ্চ অনেক অনেক বেশি | .

বাংলা নববর্ষ

Deb Prasad De | 1977 CE

দীর্ঘ বারো মাসের পাওয়া না পাওয়াকে পেছনে ফেলে নতুন আশার আলো নিয়ে আসে বছরের প্রথম দিন। এদিনে পুরনো বছরের ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, ক্লেদ-গ্লানি ভুলে গিয়ে নতুন ভাবে নতুন পথ চলার শুরু হয় স্বপ্ন পূরণের প্রত্যাশায়। এই নিয়েই আমাদের আজকের বিষয় **বাংলা নববর্ষ রচনা|**

পৃথিবীর প্রতিটি জাতিসত্তার কাছে সেই জাতির ঐতিহ্যগত নতুন বছরের সূচনা পরম পবিত্র বলে গণ্য হয়। বাঙালিও এর ব্যতিক্রম নয়। সাধারণ বাঙালি জীবনে বছরের যে কয়েকটি দিন সকল প্রকার ক্লেদ এবং গ্লানিকে ভুলিয়ে মনের অন্তঃস্থলে নতুন আনন্দের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তোলে, সেই দিনগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বাংলা নববর্ষের সূচনাকাল|

নববর্ষ সুদীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালি সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে বসন্ত ঋতুর অন্তিম মাস চৈত্রের অবসানে বৈশাখের সূচনার মধ্যে দিয়ে বাঙালি নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। বর্ষবরণের অনাবিল আনন্দে উদ্ভাসিত বাঙালির জীবন পুরাতন বছরের সকল দুঃখ ও গ্লানির কথা ভুলে নতুন করে বাঁচার আশায় বুক বাঁধতে থাকে। এই প্রসঙ্গেই কবি লিখেছেন-

"নিশি অবসান, ওই পুরাতন
বর্ষ হলো গত
আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত
বন্ধু হওশত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বছরের সাথে
পুরাতন অপরাধ যতো।"

বর্ষপঞ্জির ইতিহাস:

বাংলা সনের ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন সৌর পঞ্জিকা অনুসারে বহুকাল আগে থেকেই সৌর বছরের প্রথম দিন বাংলা, আসাম, কেরালা, মনিপুর, নেপাল ইত্যাদি বিভিন্ন ভারতীয় প্রদেশে মূলত ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে নববর্ষ পালিত হতো|

অন্যদিকে আবার বহু ঐতিহাসিক মনে করেন যে বাংলা বর্ষপঞ্জিকার পরিমার্জন এর মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা কে একটি সুষ্ঠু রূপ দেওয়ার জন্য মুঘল সম্রাট আকবর সৌর পঞ্জিকা এবং হিজরি সনের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বাংলা বর্ষপঞ্জিকার প্রচলন করেন। কিন্তু বহু ঐতিহাসিক আবার এই দাবিকে নাকচ করে দিয়ে বাংলা বর্ষপঞ্জিকে হিন্দু ঐতিহ্যের বিক্রমী দিনপঞ্জীর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেন|

একথা সত্য যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আকবরের শাসনকালের বহু আগেও বাংলা বর্ষপঞ্জিকা এবং নববর্ষ উদযাপনের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সেজন্য আকবরকে বাংলা বর্ষপঞ্জির উদ্ভাবক বলে ধরে নেওয়া যুক্তিসম্মত হবে না। আধুনিক গবেষণার ফলে মনে করা হয় গুপ্তযুগীয় বঙ্গসম্রাট শশাঙ্কের শাসনকালেই বঙ্গাব্দের সূচনা হয়।

পয়লা বৈশাখ:

বাংলা নববর্ষের কথা বলতেই সর্বপ্রথম যে দিনটির কথা আমাদের মনে আসে তা হল পহেলা বৈশাখ। এই দিনটি বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম দিন। এই দিনে দেশ ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতি নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার আনন্দে মেতে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ তো বটেই তার সাথে ত্রিপুরা এবং আসাম রাজ্যের কিছু অংশেও বাংলা নববর্ষ মহা ধুমধাম সহকারে পালিত হয়|

সাধারণভাবে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জী অনুসারে প্রতি বছর ১৪ই এপ্রিল বাংলাদেশে নববর্ষ পালিত হয়ে থাকে। বাঙালি এই সময়ে মেতে ওঠে নানা প্রকার উৎসবে। হালখাতা, বিভিন্ন শোভাযাত্রা, নানা ধরনের মেলা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। একে অপরকে শুভ নববর্ষ অভিবাদন জানিয়ে সকলের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করে বাঙালি বছর শুরু করে।

নববর্ষে বাঙালি:

নববর্ষ প্রতিটি বাঙালির জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনটিতে বাঙালি পৃথিবীর যে কোণেই থাকুক সে তার জাতীয় ঐতিহ্য উদযাপনে মেতে ওঠে। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে সর্বস্তরের বাঙ্গালীদের মধ্যে কিছু বিশেষ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। যেমন এই দিনে বাঙালি পুরুষেরা সাধারনত পাঞ্জাবি ও ধুতি এবং মহিলারা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক শাড়িতে সেজে ওঠে|

এই দিনে বাঙালি ঘরে ঘরে পান্তা-ইলিশ বিভিন্ন রকমের ভাজা খাওয়ারও প্রচলন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশ এই দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে মহা আনন্দ সহকারে উদযাপন করে। চারিদিকে পরম আনন্দের পরিবেশে বিভিন্ন মেলা ও উৎসব বাঙালি জাতির মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া সংস্কৃতিপ্রিয় বাঙালি জাতির কাছে এই দিনটি নিজেদের সংস্কৃতি চর্চার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন।

বৈশাখী মেলা:

বাংলা লোকায়ত সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে বাংলার বিভিন্ন উৎসব। সেই সকল উৎসবের মধ্যে বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত বৈশাখী মেলা অন্যতম একটি। বাংলাদেশের নগরায়নের পরিবেশেও এখনো এই মেলা আয়োজিত হয়।

বিভিন্ন গ্রাম থেকে শিল্পীরা তাদের আঞ্চলিক শিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য এই মেলায় নিয়ে আসেন। বাংলার গ্রামীণ পটচিত্র, তথা বিভিন্ন লোকগান, লোকনৃত্য ইত্যাদি এই মেলাতে স্বকীয় মর্যাদা লাভ করে। নববর্ষের আনন্দ উদযাপনের মাধ্যমে বাংলার হারিয়ে যেতে বসা আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে মর্যাদা দান এবং পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস এই মেলার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করা যায়।

হালখাতা:

বাংলা নববর্ষ উদযাপনের আলোচনায় বাঙালির হালখাতা পালনের কথাও উল্লেখ করা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। নববর্ষের এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালির উন্মাদনা বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। প্রকৃতপক্ষে এই উৎসবটির তাৎপর্য হলো বর্ষবরণ-এর শুরুতে ব্যবসায়িক হিসাবগত খাতার হাল-হকিকত যাচাই করে নেওয়া।

তবে এই উৎসবটি সকল ব্যবসায়ী মহলেই পরম রসনার সঙ্গে পালন করা হয়। সকল আমন্ত্রিত ক্রেতাকে করানো হয় মিষ্টিমুখ। ক্রেতারাও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর কাছে নিজেদের ধার বাকি মিটিয়ে পরস্পর এক শুভ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ উদযাপন:

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গেও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে বাংলা নববর্ষ পালিত হয়ে থাকে। যদিও গ্রাম বাংলার চরিত্র মূলত দুই বাংলাতেই একরকম, তবে উৎসবগুলির চরিত্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে থাকে।

যেমন পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় পালিত হয় চড়কের মেলা, লোকগানের আসর, বাউল মেলা ইত্যাদি। আবার পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান কলকাতায় নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব। তাছাড়া নববর্ষ উপলক্ষে পহেলা বৈশাখের আগে থেকেই বাজারে চলতে থাকে চৈত্র সেল।

আদিবাসীদের নববর্ষ:

সাধারণ বাঙালিদের পাশাপাশি উভয় বাংলা সংলগ্ন বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যেও বাংলা নববর্ষ পালনের প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত রয়েছে। নববর্ষের সূচনালগ্নে এই সকল আদিবাসীরা নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উদযাপন করে থাকে।

প্রান্তিক অঞ্চলের এই সকল নৃগোষ্ঠী গুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ছোটনাগপুর, পুরুলিয়া, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি গুলির নববর্ষ উদযাপনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নববর্ষ উদযাপনের তাৎপর্য:

বাঙালির নববর্ষ উদযাপনকে স্বাভাবিক আপাতদৃষ্টিতে অগণিত উৎসবের একটি সুষ্ঠু সমাহার বলে মনে হলেও বাঙালির জীবনে নববর্ষ উদযাপনের সার্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। সমগ্র একটি বছর ধরে মানুষের জীবনে যে মানসিক ক্লান্তি, গ্লানি ও হতাশা জন্ম নেয় সেগুলি থেকে মুক্তির পথ রচনাতেই উৎসবের সার্থকতা। বাঙালির নববর্ষ উদযাপন এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নয়।

উৎসবের মধ্য দিয়ে নববর্ষ পালন করে বাঙালি পুরনো বছরের সকল ক্লেদ, গ্লানি এবং জীর্ণতাকে বিসর্জন দিয়ে প্রকৃতপক্ষে নতুন জীবনের আশ্বাসকেই বরণ করে নেয়। তাছাড়া নববর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে সকল বাঙালির মধ্যে গড়ে ওঠে এক অপূর্ব স্বাজাত্যবোধ, বেঁচে থাকে বাঙালিয়ানা। বিভিন্ন উৎসবের পালনের মধ্যে দিয়ে বাংলার অগণিত মূল্যবান লোকসংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে পরিচিতি পায়। পৃথিবীজুড়ে সকল বাঙ্গালীর মধ্যে ঐক্যগত মেলবন্ধনের সেতু রচিত হয়।

আধুনিক নগরজীবনে নববর্ষ:

বর্তমান যুগে বাইরে থেকে আমদানিকৃত বিদেশী সংস্কৃতির আধিপত্যজনিত বাড়াবাড়িতে বাংলা নিজস্ব সংস্কৃতি প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। বাঙালির জাতীয় সত্তার এই সংকটকালে বাংলা নববর্ষ উদযাপন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে আজকাল বিভিন্ন স্থানে বাঙালির নববর্ষ উদযাপনের মধ্যেও অপসংস্কৃতির ছোঁয়া লক্ষ্য করা গেছে।

এই অপসংস্কৃতি থেকে বাঙালির স্বাজাত্যবোধ এবং নিজস্ব জাতীয় চরিত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে অনতিবিলম্বে আত্মসংস্কৃতির প্রতি যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বর্তমান নগরজীবনে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা দ্বারা আয়োজিত সাংস্কৃতিক উৎসব, মিলন মেলা, গ্রাম বাংলার সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা প্রভৃতি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করতেই হয়।

উপসংহার:

বাংলা নববর্ষ হল বাঙালির বাঙালিত্বকে উদযাপন করার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মধ্যে যাতে কোনোভাবেই অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে প্রতিটি স্তরে সকল বাঙালিকে সচেতন হতে হবে।

নববর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে বাঙালির বাঙালিত্ব বিশ্বায়িত হোক, বাঙালি সংস্কৃতি মর্যাদা পাক বিশ্বের দরবারে, আধুনিক ভোগবিলাসমূলক জীবন দর্শন ত্যাগ করে আপন আত্মা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির দিকে বাঙালি যত্নবান হয়ে উঠুক এটুকুই বাঞ্ছনীয়। নববর্ষে বাঙালিত্ব এবং বাঙালি সংস্কৃতির পবিত্র উদযাপনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জীবনের সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে নতুন বছর ভরে উঠুক নতুন জীবনের আশার আলোয়-

"অসতো মা সৎ গময়,

তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়,

ওঁ শান্তিঃ॥ ওঁ শান্তিঃ॥ ওঁ শান্তিঃ॥"

ভূমিকা : বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটিই হলো পয়লা বৈশাখ। পুরো একটি বছরের দুঃখ বেদনা, ক্লান্তি নৈরাশ্য পেছনে ফেলে দিয়ে বছরের নতুন এ দিনটি যখন আমাদের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়, তখন আমরা আনন্দে মেতে উঠি, উৎসবে মুখর হই। এদিনে গ্রামে গ্রামে মেলা বসে। লাঠি খেলা, গরুর লড়াই, বলী খেলা কত-না আনন্দের প্লাবন নিয়ে আসে।

বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ইতিহাস : পৃথিবীর প্রায় সব জাতিই তাদের নিজ নিজ বছরের প্রথম দিনটিকে বরণ করে নেয়। প্রাচীনকাল থেকে এরূপ বর্ষবরণের প্রথা চলে আসছে। পৃথিবীর এক এক জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এ নববর্ষ বা বছরের প্রথম দিনটিকে বরণ করে নেওয়ার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী মিসরীয়, ফিনিশীয় ও ইরানিরা যেমন বহুকাল আগে থেকে তাদের নববর্ষ পালন করে আসছে তেমনি তাদেরও আগে গ্রিক ও রোমকরা যীশুখ্রিস্টের জন্মের পঞ্চম শতাব্দী আগে থেকে এরূপ উৎসব পালন করতো বলে জানা যায়। প্রাচীন আরবীয়রা 'ওকাজ' মেলা, ইরানীয়রা 'নওরোজ' উৎসব ও প্রাচীন ভারতীয়রা 'দোল' পূর্ণিমার দিনে নববর্ষ উদযাপন করতো।

নববর্ষ পালনের তাৎপর্য : পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির মধ্যে নববর্ষ উদযাপনের সময়ের বিভিন্নতা ও রকমফের যতই থাকুক না কেন এ বিশেষ দিনটি যে আনন্দের সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। পুরাতনকে ধুয়ে মুছে মানুষ যে চিরকাল নতুনের স্বপ্ন রচনা করে চলছে এ তাৎপর্যটি নববর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই নববর্ষের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন-

এসো হে বৈশাখ
এসো, এসো,

নববর্ষ উদযাপনের রীতি : বাংলা নববর্ষের প্রবর্তন হয় ষোড়শ শতকে মোগল সম্রাট আকবরের সময়। তখন বাংলাদেশ ছিল মোগল সম্রাটের করদ (খাজনা দাতা) রাজ্য। খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য বছরের এ ত মৌসুমের প্রথম দিনটিতে অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের দিনে জমিদাররা খাজনা আদায় করতো। জমিদারদের সভাঘরে বসত 'পুণ্যাহ'।

তথ্যসূত্র

উইকিপিডিয়া

বাংলাপিডিয়া

আজতক বাংলা

জাতীয় গ্রন্থাগার

https://www.bbc.com/bengali/articles/

কবিতাগুচ্ছ

Sunil Datta | 1981 ETC

স্বামী স্ত্রীর কেমিস্ট্রি

ভাব সম্প্রসারণ আর ভাবার্থ,

দুয়ের সঠিক প্রয়োগে মেলে সুমধুর দাম্পত্য।

আপনি যদি হন স্বামী,

ভাব সম্প্রসারণ বর্জনীয়, নাহলে জীবনে আসবে অশান্তির সুনামি।

আপনি যদি হন স্ত্রী,

ভাবার্থ কখনও নয়,

যাতে স্বামীর জ্ঞান হয়।

যদি হন স্বামী, সঠিক কাজ বারণ,

মনে রাখবেন, তবেই বউ থাকবে খুশি, কারণ সে করবে শাসন।

সোশাল ডিসট্যানসিং ,

মূল কথা সিলেক্টিভ লিস্টেনিং,

যুদ্ধ আপনার আমার সবার,

যুদ্ধ জয়ে করুন হাসির ব্যবহার।

চুলের আত্মকথা

আমি চুল , থাকলে আমি পুরুষের গর্ব ,

কমে গেলে পুরুষের অহং হয় খর্ব |

কমা চুল , পোশাকী নাম টাক

এবার এর প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা যাক |

টাকের প্রথম অবস্থা , নাম মরুতীর্থ হিংলাজ ,

চুল আঁচড়ানো যেন পাকা শিল্পীর অপূর্ব কোলাজ |

পরের অবস্থা , ওরা থাকে ওধারে ,কঠিন হয় আঁচড়ানো ,

সময় লাগে বেশি , বৃথা বাড়ে অল্প চুলের যত্ন |

এর পরের টাক , নাম তার দ্বীপের নাম টিয়ারং ,

দ্বীপের আকৃতি মস্তকে পুরুষ তখন মোটামুটি সং|

স্মৃতিটুকু থাক হলো টাকের শেষ অবস্থা

চিরুনী নিস্প্রয়োজন , বিফল সব ব্যবস্থা|

প্রবাসী ছেলের কীর্তি

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান,

বর্তমানে প্রবাসী, সুদূর আমেরিকা তাঁর কর্মস্থান ||

সুখী সংসার, অকস্মাৎ চিন্তার কাল মেঘে ছেয়ে গেল গতিময় জীবন,

ছেলের ইউনিভার্সিটি খরচ জোগাড়ে স্বামী স্ত্রীর বন্ধ হোল কথোপকথন ||

একদিন সকালে হঠাৎ মুস্কিল আসান,

আমেরিকা থেকে বিধবা মা দর্শনে পাড়ি দিল কৃতি সন্তান ||

বহু দিন পর ছেলের দেখা পেয়ে মা হলেন আহ্লাদে আটখানা,

তখন জানেন না ঘটতে চলেছে কি কাণ্ড কারখানা ||

বউয়ের মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ শাশুড়ি,

নিজের বাড়ি বিক্রির প্রস্তাবে দেখতে পেলেন না কোন কারিকুরি ||

ছেলের প্রস্তাবে হলেন রাজি, ঠিক হোল আমেরিকা গমন,

তখনো পরতে পারেন নি নিজের ললাট লিখন ||

কলকাতা এয়ারপোর্ট, সকলেই বিমানের জন্য অপেক্ষমাণ,

ছেলে মাকে বলল, দেখে আসি, কখন ছাড়বে আমাদের উড়ান ||

ছেলেকে খুঁজতে গেল নাতি, নাতিকে খুঁজতে গেল

বহুক্ষণ কেটে গেলেও ফিরে এল না কেউ ||

শেষমেশ ওনার স্থান হোল পুলিশ হয়ে হাসপাতাল,

বাড়ি গেল, ঝরঝরে হল ইহকাল পরকাল ||

ছেলে মায়ের কোটি টাকার বাড়ি বিক্রির টাকা নিয়ে করেছে পলায়ন,

ঘটনা সত্যি, পৃথিবী জানুক বিশ্বাসী মায়ের অসহায় আত্মসমর্পণ ||

শিশু

ছেলেটির বয়স বছর দুই,

বেশ বুদ্ধিমান, কথাবার্তা বলে ভালই

স্কুলে যেতে হবে, সেদিন সকাল দশটা,

ওকে তৈরি করতে মার প্রায় যায় প্রাণটা|

স্মার্ট ফোনে ব্যস্ত বাবাকে শিশুর প্রশ্ন, কি ছিল তোমার স্কুলের নামটা

প্রশ্নের উত্তরে শিশুর জুটল মায়ের মুখঝামটা|

শহর কলকাতায় শিশুরা আর শিশু নেই,

তারা এখন বাবা মায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মই|

প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে তাদের হয় বলি,

হারিয়ে যেতে বসেছে শৈশবের কলকাকলি |

আমাদের সন্তানেরা আমাদের সম্পদ,

আমাদের দেখাতে হবে পরিমার্জিত দায়িত্ববোধ

শিশুর জানার কৌতুহল অপার,

উত্তরের দায়িত্ব আমাদের সবার

আসুন, সন্তানের সংঘে শেয়ার করি অভিজ্ঞতা,

তাতেই ঢেকে যাবে সমস্ত ব্যর্থতা, আসবে অমূল্য সফলতা|

কল্লোলিনী কলকাতা

শহর কলকাতা

ভ্রমণ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা ,

খুঁজে পাওয়া যায় না নিস্তব্দতা

মনে লেগে থাকে মানুষের উষ্ণতা|

ময়লায় ভরা রাস্তার কোণা,

তাতে কি, মানুষের মন যে খাঁটি সোনা,

নিঃশব্দ ভালবাসার অত্যাচারের হয় না কোন বর্ণনা

একমাত্র তুলনা, মোহময়ী সুরের মূর্ছনা|

বাজারে পাবেন টাটকা মাছ,

কিনলে বিক্রেতা বিনা পয়সায় ছাড়িয়ে দেবে আঁশ

সেই মাছের স্বাদের নেই কোন তুলনা,

প্রবাসী বাঙালির কাছে এই পরম পাওনা|

মিষ্টির দোকানে হরেকরকম মিষ্টি

জিবে জাল আসবে, এমনই সৃষ্টি |

রসগোল্লা, দই আর রকমারি সন্দেশ,

শেষ পাতে পেলে হয় খাওয়া জম্পেশ|

অভিযোগ,রাস্তার চেয়ে বেশী গাড়ি

তবে কিনা, যাতায়াত মোটেও নয় ঝকমারি |

সিগনালিং বেশ উন্নত, চালকেরা যথেষ্ট সংযত,

গাড়ির তুলনায় দুর্ঘটনা নামমাত্র|

মোবাইল আর স্মার্ট ফোন

জীবনের প্রধান অবলম্বন|

কোলকাতা বাসির জীবন আজ গতিময়

দৌড়ে জিতবে কে, মানুষ না টেকনোলজি, বলবে সময়|

বিদেশবাসি বাঙালিদের প্রতি এই আমার আহ্বান

সকলে একবার কলকাতা ঘুরে যান

যেখানে আজও ভালবাসা অম্লান|

শরাহত পারাবতের সুর : প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালের ক্ষুব্ধ কবিকণ্ঠ

Kaushik Bondopadhyay | 1978 CE

ইতিহাসের এক ধরনের স্বপ্নভঙ্গের অসহায় সাক্ষী থাকছি আমরা | বসন্ত সমাগমে যেখানে সারা বিশ্বেই মানুষ প্রেম আর স্বপ্নের পথে পাড়ি দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে, ২০২২ সালে শীতের সেই বিদায়লগ্নে যুদ্ধের দামামা আর কামানের গর্জন দেখা গেল পূর্ব ইওরোপে ! পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে টুকরো হয়ে আসা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাটোর মতো সামরিক জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলিও কম বেশি এর সঙ্গে নানা ভাবে জড়িয়ে পড়ল | বলা হয় যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে – ২০২২ বসন্তের থেকে ঘটে চলা ঘটনাবলী কি সেই পর্যায়ে পড়ে ! একদা রুশ সোভিয়েত রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় থাকা পূর্ব ইওরোপের তথা পূর্বতন ওয়ার শ প্যাক্ট সামরিক জোটের সদস্য ছোট ছোট দেশ গুলির সঙ্গে মস্কো ও মস্কোপন্থী দেশগুলির দ্বন্দ্ব – সংঘর্ষের ইতিহাস বহু পুরনো| পিছন ফিরে দেখা যাক তত্কালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উষালগ্নে উত্তাল রক্তাক্ত দিনগুলির ইতিহাস |

যখন চেকোস্লোভাকিয়ার আকাশে বসন্তে টিউলিপসহ নানা ফুলের সমারোহ ঘটে – তার অনুপ্রেরনায় নবীন প্রাণে যে কী উন্মাদনা আনে সে তারাই জানেন, যার প্রতিফলন ঘটে ১৯৬৮ বসন্তের প্রাগের বিক্ষোভে |মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ও ভাবুকেরা *1963 Libice Conference* ও *1967 Union of Czechoslovak Writers* এর ধারাবাহিকতায় শিল্প সাহিত্যে মুক্তচিন্তা ও উদারতার দাবি তোলেন – যাদের মধ্যে মিলন কুন্দেরা প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা ছিলেন | চেকোস্লোভাকিয়ার _স্তালিনপন্থী রাষ্ট্রনায়ক আন্তনিন নোভত্নি এর অপসারণের পরে ৫ জানুয়ারী ১৯৬৮ চেক কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক হয়ে আলেক্সান্ডার ডুবচেক এক উদারপন্থী বাতাবরনের পথে যান | জনমতের , বিশেষত ছাত্র-যুবদের দাবিতে সাড়া দিয়ে তিনি স্তালিন জমানায় রাজনৈতিক বন্দী বা নির্বাসিতদের পুনর্বাসন ঘটান এবং এপ্রিল ১৯৬৮ থেকে কিছু সুদূরপ্রসারী সংস্কারের সূত্রপাত করেন | সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার, স্লোভাকিয়ার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং প্রশাসনের ও অর্থনীতির আরো গনতান্ত্রিকীকরণ – যার জনপ্রিয় নাম " *Socialism with a human face* " | ডুবচেক পরিচালিত এই স্বল্পস্থায়ী সংস্কার ক্রমশ এক উভয়সংকটের মধ্যে পড়ে – একদিকে গণতন্ত্রী বা সংস্কারপন্থীরা আরো দ্রুত উদারীকরনের জন্য প্রবল দাবি তুলতে থাকে, অপর দিকে হাঙ্গেরি, পূর্ব জার্মানি প্রমুখ "ওয়ারশ প্যাক্ট" সামরিক জোটের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে দরবার করতে থাকে যে তাদের সমাজতন্ত্রগুলির ওপরেও এমন উদারীকরনের বিরূপ প্রভাব পড়বে | নতুন নানা রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয় এবং রুশপন্থীদের আশঙ্কা হয় যে চেকোস্লোভাকিয়ার গোটা ঘটনাপ্রবাহ আয়ত্তের বাইরে একটি প্রতিবিপ্লবের দিকে চলেছে |

এই সবের পরিণতিতে ২০ শে আগস্ট সন্ধ্যায় ২০০০ টি ট্যাঙ্কসহ দুই লক্ষ রুশ বাহিনী প্রবেশ করে – হাঙ্গেরী ছাড়া জোটের অন্য দেশগুলির সক্রিয় ভূমিকা এতে ছিলনা |এই আগ্রাসনে ৭২ জন চেক নাগরিক হত ও ২৬৬ জন গুরুতর আহত হন | রাষ্ট্রপ্রধান ডুবচেক জনগনকে প্রতিরোধ করতে বারণ করেন | তাঁর নেতৃত্বে বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি, বাক স্বাধীনতা, বিশেষত শিল্প-সাহিত্যের জগতে মুক্তচিন্তার যে আন্তরিক মহা মূল্যবান পরীক্ষার সুযোগ সবে দেখা দিয়েছিল – তার আশার প্রদীপ এক ফুঁয়ে যেন নিভে গেলো | এই সংস্কারগুলি, বিশেষত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণকে ব্রেজনেভ নেতৃত্বাধীন রুশ বলশেভিকরা মোটেই ভালো চোখে দেখে নি | রুশ সামরিক বাহিনী চার দিনেই এই বিদ্রোহ তথাকথিত "প্রাগের বসন্ত"কে দমন করবে কথা দিলেও, ছাত্র ও যুব বাহিনীর নেতৃত্বে নিরস্ত্র নাগরিক প্রতিরোধ বজায় ছিল ১১ মাস – কার্ফু অমান্য করে সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নানা প্রতিবাদী কর্মসূচির মাধ্যমে ; যদিও কিছু বিচ্ছিন্ন হিংসার ঘটনা ও অগ্নিতে আত্মাহুতির ঘটনা ঘটে | চেক সমাজতন্ত্রে নেতৃত্বের পরিবর্তনে ডুবচেককে সরিয়ে রুশ সমর্থনে ক্ষমতাসীন হন রুশপন্থী গুস্তাভ হুসাক এবং সামরিক জোটভুক্ত অন্যান্য দেশগুলির মতো সে দেশের শাসনও বাস্তবে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণে থাকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত | ঐ বছরেই সোভিয়েত দেশের আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গনজনিত সারা বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহে চেক ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কম্যুনিস্ট শাসনের অবসানে বহুদলীয় গণতন্ত্র আসে এক রক্তপাতহীন ভেলভেট বিপ্লবের মাধ্যমে |

তবে এমন প্রাগের বসন্ত শুরুরও একটা শুরু আছে তাদেরই প্রতিবেশী দেশে | স্তালিন-পরবর্তী রুশ রাষ্ট্রনায়ক সদ্য- নির্বাচিত নিকিতা ক্রুশ্চেভ-এর স্তালিন-শাসন বিরোধী একটি বক্তৃতায় উত্সাহিত হয়ে হাঙ্গেরির জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে হাজারে হাজারে

রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে | প্রথম পর্যায়ে হাঙ্গেরির বিপ্লবীরা জয়ী হয় এবং অগত্যা কম্যুনিস্ট পার্টি স্তালিন-বিরোধী নেতা ইমরে নেগি কে প্রধানমন্ত্রী করে– যিনি বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন | ১ লা নভেম্বর ১৯৫৬ তিনি রুশ নেতৃত্বের "ওয়ার শ প্যাক্ট" সামরিক জোট ছেড়ে হাঙ্গেরির জোট-নিরপেক্ষ নীতি *(NAM)* ঘোষণা করে রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতির জন্য আবেদন করেন | কিন্তু পশ্চিমী বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশগুলি রুশ জোটের সঙ্গে সম্ভাব্য সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কায় সমর্থনে পিছিয়ে যায় | পরিণতিতে ৪ঠা নভেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্যাঙ্ক ও সেনাবাহিনী হাঙ্গেরির বিপ্লব দমনের জন্য রাজধানী বুদাপেস্ট প্রবেশ করে |এই ঝটিকা আক্রমনে বহু সহস্র দেশবাসী মারা যান এবং বহু লক্ষ দেশত্যাগ করেন | অসহায় নেগি সেদিন বিকেল ৫ টা ২০ মিনিটে আধ ঘন্টার জাতির উদ্দেশে বেতার- ভাষণের পর যুগোস্লাভিয়ার দূতাবাসে আশ্রয় নিলেও, দেশদ্রোহিতার দায়ে প্রবল সোভিয়েত রাষ্ট্র তাঁকে প্রাণদন্ড দেয় ১৯৫৮ সালে | তবে তাঁর শহীদ হওয়ার মূল্যে হাঙ্গারি কিছু স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ পায় – স্তালিনপন্থী শ্বাসরোধকারী রুশ নিয়ন্ত্রণ আর ফিরে আসে নি |

রুশ – ইউক্রেন যুদ্ধের এই সংকটকালে আবার করে ফিরে পড়ে দেখা যাক ইংরাজি ভাষায় লিখিত এমন কিছু কবিতা যেগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে বসে লেখা বললে খুব ভুল হবে না – কারণ এই কবিরা সবাই একদা এই মহাযুদ্ধে সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছেন | এই কবিতাগুলি সারা বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী সাহিত্যের ঐতিহ্যে মূল্যবান সংযোজন হিসাবে বিবেচিত হবে |

John McCrae - এই কবি কানাডার অন্টারিওতে জন্মগ্রহণ করেন | তিনি টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষান্তে স্বর্ণপদকসহ মেডিকেল ডিগ্রী লাভ করেন | চিকিত্সক হিসাবে তিনি কানাডার প্রায় সব বিখ্যাত হাসপাতালে সুনামের সঙ্গে কাজ করেন | বিভিন্ন সময়ে তিনি টরন্টো জেনারাল হাসপাতাল, জন হপকিন্স হাসপাতাল, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়, রয়াল আলেক্সান্দ্রা হাসপাতাল, মন্ট্রিল জেনারাল হাসপাতাল এবং মন্ট্রিলের রয়াল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে চিকিত্সকের দায়িত্বে ছিলেন | ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধে গোলন্দাজ বাহিনীতে চিকিত্সকের দায়িত্ব পালন করেন | ১৯০৪ সালে মেজর পদে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কানাডিয় বাহিনীভূক্ত হন | কবি রয়াল কলেজ অফ সার্জেনের সদস্যপদ লাভ করেন এবং প্রথম কানাডীয় হিসাবে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে " পরামর্শদাতা শল্য-চিকিত্সকের " দায়িত্ব গ্রহণ করেন |

কবির এই বিখ্যাত পপি ফুলের সারি কবিতাটিতে ১৯১৫ সালে বেলজিয়াম প্রান্তে যুদ্ধের স্মৃতিচারণ রয়েছে | এই যুদ্ধে কবি ১৭ দিন ধরে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করেন | এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যুতে কবি এটি লেখেন – প্রথম প্রকাশিত হয় *Punch* পত্রিকায় | এরই সূত্র ধরে যুদ্ধে মৃত ব্রিটিশ ও কমনওয়েলথ নাগরিকদের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে পপিফুলকেই বেছে নেওয়া হয়েছে | এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি ২৮ জানুয়ারী ১৯১৮ তারিখে ৪৫ বছর বয়সে নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন |

Siegfried Sassoon - এই কবি তাঁর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপরে রচিত ক্ষুব্ধ ও সহানুভূতিশীল কবিতাগুলির জন্য সুপরিচিত এবং ব্যাপকভাবে সারস্বত সমাজে আলোচিত | কোনো আবেগপ্রবণতা বা যুদ্ধোন্মাদ মনোভাব বাদ দিয়ে কবি বহু কবিতায় সরাসরি মৃত্যু-গহ্বরসম যুদ্ধ – পরিখার নৃশংসতা ও ভয়াবহতার বর্ণনা করেছেন | কবি দেখিয়েছেন উপরতলার সেনাপতি, রাজনৈতিক শাসকগোষ্ঠী, গির্জার যাজক ও ক্ষমতাশালীদের অযোগ্য, দায়িত্বহীন ও ঘৃণ্য ভূমিকা এবং যুদ্ধের সপক্ষে তাদের নগ্ন ওকালতি! এই কবি ছিলেন ঔপন্যাসিক ও রাজনৈতিক প্রতিবেদক হিসাবেও সুখ্যাত | ১৯৫৭ সালে তিনি কবিতায় *Queen's medal* লাভ করেন |

এক ধনী ইহুদি পরিবারে কবির জন্ম হয়েছিল | প্রথম বিশ্বযুদ্ধর সূত্রপাত হলে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯১৫ সালে ফ্রান্স সীমান্তে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন | প্রচন্ড গোলাবর্ষণের মধ্যেও এক আহত সহযোদ্ধাকে বয়ে নিয়ে আসার জন্য তিনি *Military cross* সম্মানে ভূষিত হন | কবি নিজে যুদ্ধরত অবস্থায় রণক্ষেত্রে আহত হবার পরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি খোলা চিঠি লেখেন, যেটি সংসদে পঠিত হয় – যার জন্য তিনি তত্কালীন ব্রিটিশ প্রশাসনের রক্তচক্ষুর শিকার হন | কবির বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালের উদ্যোগকে কবি *Robert Graves* কোনমতে নিরস্ত করেন এই যুক্তিতে যে – কবি *Siegfried Sassoon* রণক্ষেত্রে কামানের গোলায় আহত, বর্তমানে হাসপাতালে চিকিত্সাধীন ও তাঁর শুশ্রূষা প্রয়োজন | ১৯১৭ সালে কবি এভাবে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন |

Counter-Attack and Other Poems কবিতা সংকলনে কবির সেরা যুদ্ধবিরোধী কবিতাগুলি একত্রিত হয়েছে | *Dictionary of Literary Biography* বইতে মার্গারেট বি ম্যাগডয়েল এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন–"তীব্রভাবে বাস্তববাদী,আক্ষেপমূলক অথবা ব্যঙ্গাত্মক |" তাঁর পরবর্তী কবিতা সংকলন " *The War Poems* " বইটিতে হাসপাতালে রণক্ষেত্রের আঘাত থেকে কবির আরোগ্যের সময়কালে রচিত ৬৪ টি কবিতাগুলিকে তিনি স্থান দেন | এই বইটির ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় | কিছু পাঠকের অভিযোগ ছিলো – কবিতাগুলিতে কবির দেশপ্রেমের পরিচয় প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে | আরেক মহল মনে করেন – রণক্ষেত্রের খুঁটিনাটি বিষয়ে কবির বর্ণনা হলো *shockingly realistic* - তার বাস্তবতা এতই চরম পর্যায়ের যে পাঠকের নির্লিপ্ত অস্তিত্বে একটা ঝাঁকুনি দেয় | এমন কি তাঁর শান্তিকামী *(Pacifist)* বন্ধুদেরও বেশ অপছন্দ ছিলো কবির সাহিত্যে যুদ্ধের হিংস্রতা ও বর্বরতার অনুপুঙ্খ ছবির মতো বর্ণনা ! তা সত্বেও ব্রিটিশ জনসাধারণ *Siegfried Sassoon* এর বই কিনেছিলো : কারণ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে উদ্ভাসিত হয়েছিলো রণক্ষেত্রে পরিখার অন্ধকূপে যুদ্ধরত ব্রিটিশ সৈনিকদের যন্ত্রণা , বিষাদ , ক্লান্তি - প্রায় অন্তহীন এক যুদ্ধের শেষ দেখতে না পেয়ে ! টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট কাগজের সমালোচক লিখেছিলেন – " কবিতাগুলির এক ধরনের নৈরাশ্যবাদ বা সিনিক মনোভাবের পিছনে অনুভুতির তীব্রতা রয়েছে |" মার্গারেট বি ম্যাগডয়েল লিখেছেন – " *Siegfried Sassoon* কে পাঠক মনে রাখবেন তাঁর প্রায় ১০০ টি কবিতার জন্য , যেখানে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে চালিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করেছেন |"

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে কবি সক্রিয় রাজনীতিতে লেবার পার্টিতে যোগ দেন | তিনি এই পর্বে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি ট্রিলজি – তিন পর্বে একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখেন | তাতে সমগ্র কাহিনীসূত্রটিকে বাস্তবের ভিত্তিতে অবিকৃত রেখে শুধুমাত্র চরিত্র বা কুশীলবদের নামগুলি কাল্পনিক ব্যবহার করা হয় | কিছু পাঠক কবির কাব্যসম্ভারের তুলনায় উপন্যাসের কদর বেশী করেন | তাঁর কবিতার মতো এই ত্রয়ী উপন্যাসেও সমানভাবে কবি যুদ্ধের বর্বর , অমানবিক , কদর্য দিক এবং ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা সমাজ ও রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক ও প্রশাসকদের কপটতা , অপদার্থতা ও নির্লজ্জ হৃদয়হীনতাকে সার্থকভাবে উন্মোচিত করেছেন | সব দেশে সব কালেই হয়তো প্রকৃত কবি ও দার্শনিকেরা সারা বিশ্বব্যাপী এক শুভ সমাজের স্বপ্ন

দেখেছেন | বাংলার এক গীতিকবির ভাষায় বলা যায় – " অন্তবিহীন এই অন্ধ রাতের শেষ / কোথা যে তোমার সেই / চোখের আলোয় দেখা / সোনালী সাধের দেশ ! "

সত্য উদ্ঘাটন

ভাষান্তর : কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পূব থেকে পশ্চিমে অন্ধকার আকাশে

সশব্দে হন্তারক যন্ত্র উড়ে বেড়ায় |

একই অন্ধকারে পশ্চিম থেকে পূবে

পাখা মেলে সেই কালান্তক যন্ত্র !

পেরিয়ে যাবার আগে ধ্বংস-চিহ্নিত শহরে

ছুঁড়ে দেয় প্রাণঘাতী বাণ -

কোনো মুখ তারা দেখতে পায় না পাথরের গায়ে :

কানে পৌঁছয় না রক্তপাতের আর্তনাদ !

পিছনে ফেলে যায় তারা ধ্বংসাবশেষ এবং

বিনিময়ে মেলে তাদের একই রকম ধ্বংসস্তূপ :

অন্যের ভূমিতে শোকাকুল অচেনা মানুষ

নিজের নিজের দুয়ারে হাহাকার করে !

মূল কবিতা : *Revelation – William Soutar*

সোম প্রবাহের স্মৃতি

ভাষান্তর : কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এদের কি কোনো শেষ নেই –

এই কাদা, ভেজা ছায়ামূর্তিদের কাতার

অন্তহীনভাবে আসতেই থাকছে

সারি দিয়ে নোংরা জলাভূমির মধ্যে !

পিঙ্গল স্রোতের জল

ঘাস আর নলখাগড়ার

ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে চলেছে এবং

ইস্পাতের ডানাগুলির বাজনা যায় শোনা |

পর্বতশিখরগুলি সূর্যালোকে উজ্জ্বল -

পরিচিত জায়গাগুলিরও পরিবর্তন হয়নি ;

দিনের কাজের শেষে পরিচিত আড্ডা ,

হাসাহাসি এবং খুচরো কৌতুকে

উদ্ভাসিত বয়স্কদের মুখ |

আমি ফিরেছি এখানে – শস্যক্ষেত,

ঝোপঝাড়ের স্নেহ, বাছুরের হাম্বারব !

কিন্তু আমার মন কেবলই যা দেখে চলে তা হলো –

ভাঙ্গা ডালপাতায় মাখামাখি কম্পমান কাদা এবং

সোম নদীর* কালো জলের প্রবাহ,ছায়ামূর্তিরা !

মূল কবিতা: *The Farmer Remenbers the Somme – Vance Palmer*

* সোম হলো ফ্রান্সের একটি নদী – বহু যুদ্ধের সাক্ষী

পপি ফুলের সারি

ভাষান্তর : কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিখয়াত ফ্ল্যান্ডার্স সমরাঙ্গনে* পপি ফুলেরা দোলে –

সারিবদ্ধভাবে ক্রশগুলির মাঝের ফাঁকগুলিতে

নির্দিষ্ট করা আছে আমাদের স্থান এবং আকাশে

স্কাইলার্ক সদর্পে গেয়ে বেড়াচ্ছে – নীচের

বন্দুকগুলির গর্জনে তার সুরমাধুর্য কদাচিৎ যায় শোনা !

আমরা হলাম মৃত সৈনিকেরা ; কিছুদিন আগেও

আমরা জীবিত ছিলাম, ভূপাতিত হয়ে দেখলাম

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিপাত – আমরা প্রেম দিলাম ,

প্রেমের জোয়ারে ভাসলাম এবং এখন

আমরা শুয়ে রয়েছি বিখ্যাত ফ্ল্যান্ডার্স সমরাঙ্গনে !

শত্রুদের সঙ্গে আমাদের বিবাদের দায় তোমরা

কাঁধে তুলে নাও , তোমাদেরই হাতে তুলে দিলাম

আমাদের শিথিল হাত থেকে খসে পড়া জ্বলন্ত মশালগুলি –

আবার উঁচুতে তুলে ধরে রাখার জন্য !

আমরা যারা মরণের কোলে ঢলে পড়লাম –

তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা যদি না রাখো,

তাহলে এই সমরাঙ্গনে মঞ্জরিত পপিফুলগুলিও

আমাদের অবসন্ন চোখে ঘুম আনতে পারবে না |

মূল কবিতা: *In Flanders Fields 1915 – John McCrae*

*ফ্ল্যান্ডার্স সমরাঙ্গন হলো বেলজিয়ামের উপকণ্ঠে একটি প্রান্তর – যেটি বিভিন্ন সময়ে বহু যুদ্ধবিগ্রহের জন্য বিখ্যাত |

প্রস্তর স্বাক্ষর (১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ)

ভাষান্তর : কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

যতক্ষণ না আমি যুদ্ধে যোগ দিলাম (লর্ড ডার্বির মতলব মাফিক)

সঙ্গী ভূস্বামীটি ঘ্যানঘ্যান আর উপহাস করতে থাকলো আমাকে |

আমি মারা গেলাম নরকে (যাকে তারা বেলজিয়ামের প্রান্তে

একটি গ্রাম বলে লোকে জানে); আমার যুদ্ধক্ষত ছিলো অল্পই –

আমি হামাগুড়ি দিয়ে ফিরছিলাম , এমন সময়ে

একটি গোলা ফাটলো আমাদেরই পরিখার গায়ে –

ফলে আমি পড়ে গেলাম এক অন্তহীন

কাদার অতলে এবং চোখে অন্ধকার দেখলাম |

গির্জায় প্রার্থনাকালে এই ভূস্বামীটি যখন তার নির্দিষ্ট আসনে বসে,

স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তালিকার দিকে সে একাগ্র মনোযোগে বাধ্য হয় –

কারণ শেষের দিকে হলেও, সেই তালিকায় স্পষ্টভাবে রয়েছি আমি |

নামটি উল্লেখিত হয়েছে "*গর্বিত ও মহিমান্বিত স্মৃতিতে*"-

যেটুকু আমার প্রাপ্য | আমি লড়েছি ফ্রান্সের রণাঙ্গনে

দুটি রক্তাক্ত বছর ধরে এই ভূস্বামীটির জন্য ; তিনি কল্পনাও

করতে পারেন না – কতো মনোকষ্ট আমাকে সহ্য করতে হয়েছে !

একবার আমি বাড়ি ফিরলাম ছুটিতে , তো আবার ডাক পেয়ে

গেলাম পশ্চিম রণাঙ্গনে ! এর থেকে বড় আর

কোন মহিমা মানুষ আশা করতে পারে ?

মূল কবিতা: *Memorial Tablet (War of 1914-18) – Siegfried Sassoon*

টেনিসের সেকাল ও একাল

Himangshu Nath | 1977 EE

টেনিস খেলাটা ফুটবল বা ক্রিকেট গোত্রীয় নয়, কোনোদিন ছিলোও না, কিন্তু বিশেষ কৌলীন্য ছিলো, আর সবসময়েই ক্রীড়া প্রেমিকদের কাছে উৎসাহ জাগিয়ে রেখেছে।

টেনিস ব্যাক্তিগত নৈপুণ্যের, ব্যাক্তিগত সক্ষমতা ও কৃতিত্বের খেলা, কিন্তু জনপ্রিয়তার নিরিখে বিশেষ উচ্চমানের। এটি কোন দল ভিত্তিক খেলা নয়, ক্লাব বা বিশেষ গোষ্ঠীর খেলাও নয়। সুতরাং সাধারণ লোকেদের যখন কোন একজন খেলোয়ারকে পছন্দ হয়, সেখানে "আমার দেশের প্লেয়ার" এই অনুভূতিটা আসে না। বিশ্বের সেরা প্লেয়াররা যখন কোর্টে নামেন, তখন "দেশের হয়ে খেলছি, দেশের সম্মান রাখতেই হবে", এই মানসিকতা নিয়েও ওনারা কোর্টে নামেন না। নিজের ব্যাক্তিগত স্কোরিংটাই তখন ওঁদের কাছে মূখ্য। তবে ডেভিস কাপ (পুরুষ) বা ফেড কাপ (মহিলা) দলবদ্ধ খেলা, দেশের নাম নিয়ে খেলা হয়, তবুও এখানেও খুব বেশি দেশাত্মবোধক অনুভূতি নজরে আসে না।

ভারত ডেভিস কাপে অংশগ্রহণ করে, এবং ফলাফল যথেষ্ট কৃতিত্বপূর্ণ। তিনবার রানার্স আপ। এরমধ্যে ১৯৭৪ সালে কাপ জেতার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়। কারন ফাইনালে অপর দিকে দঃ আফ্রিকার সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে ভারত খেলতে অস্বীকার করার ফলে খেলা বাতিল হয়। তখন অমৃতরাজ ভাইদের দীপ্তি ছড়াচ্ছে বিশ্বময়, সঙ্গে ছোটো (রমেশ) কৃষ্ণণ। কিন্তু ভারতের জেতা বা ভালো পারফরম্যান্সের জন্য কোথাও বিজয় মিছিল দূরে থাক, মামুলি পটকা ফাটানোও শোনা যায় না।

যশস্বী খেলোয়াড়দের কথা লিখতে গেলে একটুও না থেমে ডন বাজ্ (আমেরিকা) এবং ফ্রেড পেরি (বৃটেন) থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু সেটা অনেকটাই অরণ্যদেবের মজবুড়োর মতোই

বাচ্চাদের পুরোনো দিনের গল্প শোনানোর মতো হয়ে যাবে। বরং একটু জাম্পকাট করে ১৯৬০ টপকে যাই।

তখন টেনিস জগৎ দুভাগে বিভক্ত। এমেচার ও প্রফেশনাল। পুরো শাশুড়ি-বৌমা সম্পর্ক। এই সময় (মোটামুটি ১৯৬৫) আমেরিকান রঙ্গমঞ্চে জ্যাক ক্র্যামার নামে একজন আবির্ভুত হন। ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার ক্যারি প্যাকার যে কাজটি তার নিজস্ব টিভি চ্যানেলের (চ্যানেল নাইন) মাধ্যমে করেন, সেই রকম পরিবর্তন নিয়ে আসেন এই ক্র্যামার সাহেব। প্যাকার সাহেব ধনকুবের ছিলেন, গোটা অস্ট্রেলিয়ায় দাপটে মিডিয়া ব্যারন শাসন করতেন। ক্রিকেট না খেললেও অর্থ ও প্রতিপত্তি দিয়ে ক্রিকেটের খোলনলচে বদলে দেন। এই ক্র্যামার সাহেবের অর্থের দাপট ছিলো না, কিন্তু অতি উঁচুমানের টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন এবং জনসংযোগ - বিশেষতঃ প্লেয়ারদের সঙ্গে। বাকি রইলো স্পন্সর যোগাড়। তখন টেনিসের তারকারা দুটি প্রধান দলে বিভক্ত, এমেচার ও প্রফেশনাল। যারা প্রফেশনাল, তাঁরা অলিম্পিকে খেলতে পারবেন না। তখন জ্যাক ক্র্যামার *ATP* (*Association of Tennis Professionals*) গঠন করলেন যা এখনও পর্যন্ত টেনিসের প্রধান শক্তিশালী সংঘটন। ১৯৬৮ সাল থেকে এমেচার-প্রফেশনাল সবাই *ATP* র ছাতার তলায় এসে যায় ও টেনিসের গতিপ্রকৃতিও আমূল পাল্টে যায়।

ATP গঠনের পরেই টেনিস জগতের পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। প্রথমেই নজরে আসে ইউরোপের উত্থান। *ATP* পূর্ববর্তী টেনিস প্রধানতঃ দুই ভরকেন্দ্র ছিলো আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই সীমিত, যদিও তারকাসমৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়া দক্ষতা ও গ্ল্যামারে অনেকটাই এগিয়ে ছিলো। তখনের সারা জাগানো অধিকাংশই অস্ট্রেলিয়ার - নিইল ফ্রেজার, ফ্রেড স্টোল, জন নিউকোম্ব, কেন রোজওয়াল....

কিন্তু এদের মধ্যে সূর্যের দীপ্তি নিয়ে উজ্জ্বল ছিলেন রডনি জর্জ লেভার, আমরা সংক্ষেপে জানি রড লেভার। ১৯৫৯ সালে উনিশ বছর বয়সে প্রথম বড় জয়, সেইবছরের জুনিওর ইউএস আর অস্ট্রেলিয়ান টাইটেল। তারপর থেকে ১৯৬১ ৬২ দু'বছর এমেচার সার্কেলের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং এ এক নম্বরে। এরপরে ১৯৬৪/৬৫ থেকে ১৯৬৯/ ৭০ পর্যন্ত বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং এ টানা এক নম্বরে। খেলোয়াড় জীবনে ১৯৮টি সিঙ্গলস টাইটেল জিতেছেন, ১১টি গ্র্যান্ড স্লাম, আর ৮টি প্র-মেজর টাইটেল। অস্ট্রেলিয়াকে পাঁচবার ডেভিস কাপ দিয়েছেন। একমাত্র তারকা যিনি দু'বার গোল্ডেন স্ল্যামের অধিকারী, একবার এমেচার ১৯৬২ সালে আর পরে প্রফেশনাল হিসেবে ১৯৬৯ সালে। তারই মাঝে ১৯৬৭ সালের প্র-স্লামের অধিকারী, মানে বিশ্বের তিনটি প্র-টুর্নামেন্টই জিতেছিলেন। আরও আছে, গ্রাস, হার্ড, ক্লে, উড - সবরকমের কোর্টেই ইনি টুর্নামেন্ট জিতেছেন। টেনিস সার্কেলে এনার নাম 'লেজেন্ড', টেনিসের সঙ্গে সম্পর্কিত সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে এই নামে ডাকেন। একবার টিভি ইন্টারভিউতে দেখেছিলাম ফেডেরার উইমবল্ডন সেন্টার কোর্টে যাবার সময় লেভারের মুখোমুখি হয়ে যান। লেভারকে শুধু 'স্যার' বলে সম্বোধনই করছিলেন না, শরীরের ভাষায় মনে হচ্ছিল ফেডেরার স্কুলের ছাত্র, সামনে হেডমাস্টার ! ২০১৭ সাল থেকে চালু হয় লেভার কাপ ইনডোর হার্ড কোর্ট ট্রফি, ইউরোপ বনাম রেস্ট অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড। এরকম সম্মান টেনিস জগতে আর কেউ পায়নি। সাধারণত ইউএস ওপেনের দু'সপ্তাহ পরে শুরু হয়, প্রতি বছর বিভিন্ন দেশ এর দায়িত্ব নেয়। এছাড়াও ২০০০ সালে বছরের প্রথম *ATP* টুর্নামেন্ট অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ভেন্যু মেলবোর্ন কোর্টের নাম সেন্টার কোর্টের পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ হয়েছে, *Rod Laver Arena* এককথায় এত সম্মান টেনিস জগতে আর কেউ পায়নি।

ATP পরবর্তীকালে ইউরোপের উত্থান সুরু হয়। সুইডেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী, চেকোস্লভাকিয়া, রাশিয়া সব দেশেই টেনিস ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে থাকে। তার অন্যতম কারণ বিশাল অর্থের হাতছানি, আর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি। বিয়র্ন বর্গ, ইভান লেন্ডল, বুম বুম বেকার, স্টিফেন এডবার্গ, ইলি নাসতাসে, ইয়ানিক নোয়া, ম্যাটস উইল্যান্ডার, আন্দ্রেই জেরারড এবং আরও অনেকেই একে একে উঠে আসতে থাকেন। অন্যদিকে আমেরিকার সাপ্লাই লাইন চালু থাকলো আরথার এ্যাশ, জন ম্যাকেনরো, আন্দ্রেই আগাসি, পেট সাম্প্রাস আর মহিলাদের চোখের তারা, দিল-কি-ধরকন বিশেষ কায়দায় স্কুলবয়দের মতো ছাঁটা চুল - জিমি কোনারস। আর্জেন্টিনা থেকেও কয়েকজন এলেন গিলমোর ভিলাস, ভিটাস গেরুলাইটিস। আমাদের বিজয় অমৃতরাজ। এরপর যে সকল দেশ বিশ্বের টেনিস সার্কিটে কোনদিন ছিলোই না, সেখান থেকেও হঠাৎ হঠাৎ করে ঝলক দেখা দিলো। ক্রোয়েসিয়ার গোরান ইভানিসেভিক, মেক্সিকোর রাউল র‍্যামিরেজ, ইকুয়েডরের আন্দ্রেজ গোমাজ, স্পেনের কার্লোস ময়া, এমিলো স্যাঞ্চেজ, ম্যানুয়েল ওরান্টেস এবং আরও অনেকেই। এই দেশিগুলিতে আমাদের ভাষায় টেনিসের পর্যাপ্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকলে আমরা হয়তো আরও অনেক তারকার দর্শন পেতাম। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার গৌরব এক আধটা ঝলকানি (প্যাট ক্যাশ) দিয়ে ঝিমিয়ে গেলো।

অন্যদিকে পুরুষ খেলোয়াড়দের দাপটের মধ্যেও মহিলা খেলোয়াড়দের দ্যুতি উজ্জল হয়ে উঠলো। বিলি জিন কিং, মার্গারেট কোর্ট, ইভন গুলাগাং, ট্রেসি অস্টিন..... । এখানেও সাপ্লাই লাইন আমেরিকা- অস্ট্রেলিয়া। পুরুষদের মধ্যে যেমন রড লেভার, মেয়েদের মধ্যে ছিলেন মার্গারেট কোর্ট এবং ইনিও অস্ট্রেলিয়ার। মার্গারেট কোর্ট এবং গোল্ডেন স্ল্যাম। মার্গারেট কোর্টে নামা মানেই সাসপেন্স যে কত স্কোরে জিতবেন! মার্গারেট কোর্টের পরে চারজন সুন্দরী কোর্টের ভিতরে-বাইরে সবার উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলেন। আমেরিকার ক্রিস এভার্ট, জার্মানির স্টেফি গ্রাফ, রাশিয়ার মারিয়া সারাপোভা আর ল্যাটিন আমেরিকার ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর দেশের গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনি, সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে সামান্য মাজা রঙের (সাহেবরা বলেন কপার কালার স্কিন)। যারা টেনিসে উৎসাহী ছিলেন, বা খবর রাখতেন, এই চার সুন্দরীদের অন্ততঃ একজনও যদি তাঁদের হৃদয়ে দোলা না দিয়ে থাকেন, তবে ওনাদের হৃদয়ে নির্ঘাত পেসমেকার বসানো।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ৭০-এর দশকে কোনারস-এভার্টের রোমান্স, বিশেষতঃ পাশাপাশি উইমবল্ডন ট্রফি নিয়ে সেই ছবি আর পোস্টার দেশবিদেশের রাস্তার ফুটপাথে হট কচুরিজের মতো বিক্রি হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে যারা এসেছেন, সবার আগে নাম করতে হয় সেরেনা উইলিয়ামসের। পুরুষ বা মহিলা, একমাত্র তিনিই ৬ বার চার গ্র্যান্ড স্লামের মধ্যে তিনটে জিতেছেন। এই রেকর্ড কবে কে ভাঙ্গবে বলা মুস্কিল। ২৩ টি গ্রান্ড স্লাম, *Open Era* যুগের বিশ্বরেকর্ড, হার্ড কোর্টে ১৩ টি

সিঙ্গলস টাইটেল যা *Open Era* যুগের বিশ্বরেকর্ড, ৭৩ টি সিঙ্গলস টাইটেল, টানা ৩১৯ সপ্তাহ *Women's Tennis Association* (WTA) এর র‍্যাঙ্কিং এ ১ নম্বরে, আর পুরুষ বা মহিলা, একমাত্র যিনি সিঙ্গলস ও ডাবলসে *Career Golden Slam* জিতেছেন।

এই দুই উইলিয়ামস বোনের টেনিস দাপটেই অনেকেই ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন। এই দুই মেয়ের খুবই সংগ্রামী জীবন, শুধুমাত্র ট্রফি আর বিরাট প্রাইজ মানিই জেতেন নি, আমেরিকার কমবয়সীদের মধ্যে ভোটে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে জিতেছেন।

তবে অন্যরাও মাঝে মাঝেই শিরোনামে এসেছেন। ভার্জিনিয়া ওয়েড, হানা মান্ডালিকোভা, নাভ্রাতিলোভা, আরান্তা স্যাঞ্চেজ ভিসারিও, হেলেনা সুকোভা, জনা নোভতনা, মার্টিনা হিঙ্গেস, মনিকা সেলেস। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার ইলানা ক্লোস কিছুদিন দাপটের সঙ্গে খেলেছেন।

উইলিয়ামস দুই বোন আমেরিকার ৫০ তারা খচিত পতাকার মান রাখলেও পুরুষ টেনিসে একচ্ছত্র আধিপত্য কিন্তু তিন ইউরোপীয় দৈত্যের কব্জায়, প্রায় একই সময়ে। এই তিন গালিভারের পাশে বাকি সবাই লিলিপুট। এরা তিনজনে সব ভাগাভাগি করেই থেমে থাকেন নি, গত ২০ বছরে ৮০টি গ্র্যান্ড স্লাম (২০*৪) ফাইনালে মাত্র দুবার ঘটেছে যখন এই তিন মূর্তির অন্ততঃ একজন ফাইনালে ছিলেন না! অবিশ্বাস্য !

সার্বিয়ার নোভাক জিকোভিচ জিতেছেন ২৩টি গ্রান্ড স্লাম, তার মধ্যে রেকর্ড ১০টি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। ১২ বছরে বিভিন্ন সময়ে ৩৮৯ সপ্তাহ *ATP* র‍্যাঙ্কিং এ ১ নম্বরের বিশ্বরেকর্ড করেছেন। টেনিস সার্কিটে জিতেছেন ৯৪টি *ATP* সিঙ্গলস, তার মধ্যে ২৩টি মেজর, আর ৩৮টি মাস্টার্স।

স্পেনের রাফেল নাদাল জিতেছেন ২২টি গ্রান্ড স্লাম, তার মধ্যে একটি গোল্ডেন স্লাম আর রেকর্ড ১৪টি ফ্রেঞ্চ ওপেন। বিভিন্ন সময়ে ২০৯ সপ্তাহ *ATP* র‍্যাঙ্কিং এ ১ নম্বরে থেকেছেন। টেনিস সার্কিটে জিতেছেন ৯২টি *ATP* সিঙ্গলস, তার মধ্যে ৩৬টি মাস্টার্স। তাঁকে বলা হয় ক্লে কোর্টের মাস্টার, জিতেছেন ৬৩টি টাইটেল।

সুইস রজার ফেডেরার জিতেছেন ২০টি গ্রান্ড স্লাম, তার মধ্যে রেকর্ড ৮টি উইমবলডন ওপেন। টানা ৩১০ সপ্তাহ *ATP* র‍্যাঙ্কিং এ ১ নম্বরে থেকেছেন। টেনিস সার্কিটে জিতেছেন ১০৩টি *ATP* সিঙ্গলস।

উপরের তিনজনের তিনরকম ঘরাণা। কেউ স্পেন থেকে প্যারিসের রোলা গ্যাঁরোতেই ক্লে কোর্টেই ঘরবাড়ি, কারো সার্বিয়ার মফস্বল থেকে মেলবোর্ন পার্কেই হার্ড কোর্টে এপার্টমেন্ট কিনে পাকাপাকি জমিদারি। আর তৃতীয় জন? তার সম্বন্ধে আর এক আইকন জিমি কোনর্স তার রিটায়রমেন্টের টুইটারে কি লিখেছিলেন - সেটাই যথেষ্ট পরিচয়...

In the modern game of tennis, you are either a Clay Court specialist, or a Grass Court specialist, or a Hard-Court Specialist or you are Roger Federer.

এছাড়া সমসাময়িক খেলোয়াড়দের কি মনোভাব সেটা কথায় প্রকাশ নেই। শুধু একটা ছবিতেই সব প্রকাশ.. শেষ খেলায় ফেডেরার ও নাডাল - চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, দুজনেই চোখের জলে পাশাপাশি .... এরকম না আগে হয়েছে না হবে? লোক দেখানো টুইটার ফেবুতে শ্রদ্ধা নয়, দুজন অতি সমর্থ জগতখ্যাত স্পোর্টসম্যানের কান্না!

"You are never really playing an opponent. You are playing yourself, your own highest standards, and when you reach your limits, that is real joy." —Arthur Ashe

টেনিস যে শুধুই খেলার নিয়মে বাঁধা ছিলো তা নয়। বিশেষ কয়েকজন এটিকে বিচিত্র রকমের বানিজ্যিক বিনোদনেও ব্যাবহার করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য *Battle of the Sexes*, ১৯৭৩ সালে ৫৫ বছরের ববি রিগস ২৯ বছরের বিলি জিন কিং কে সিঙ্গলস ম্যাচের জন্য চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। আহ্বান বা অনুরোধ নয়, চ্যালেঞ্জ করে সরাসরি কোর্টে নামতে বললেন। বিলি জিন কিং রাজি হলেন না, মার্গারেট কোর্ট অবশেষে রাজি হলেন। তখন উনার বয়স ২৯, এক বছরের সন্তানের মা। তখনও তিনি *ATP* শীর্ষতালিকায় এক নম্বরে। এবং শীঘ্রই কোর্টে ফিরে আসতে চাইছেন। নতুন কিছু উত্তেজনার আশায় *CBS Sports* টিভি কোম্পানি এগিয়ে এলো, স্পনসররাও হাত বাড়িয়ে দিলো। খেলার দিনও ধার্য্য করা হয়েছিলো এক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দিনে, ১৩ই মে, আমেরিকায় মাদার্স ডে। সেদিন কোর্টে পাঁচ হাজার আর টিভিতে আনুমানিক ৫০ লক্ষ আমেরিকান আর অন্যসব দেশ মিলিয়ে ৯০ লক্ষ লোক এই ম্যাচ দেখেছিলেন। তবে কয়েকজন স্পোর্টস বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, মেয়েরা যে টেনিসে অনেকটাই এগিয়ে গেছে, সেটা "প্রমোট" করাও ছিলো এই ম্যাচের আরেকটি উদ্দ্যেশ্য।

ববি রিগসের টেনিস ক্যরিয়ার কিন্তু বেশ ভালো। ৪০ এর দশকে তিন তিনটে উইমবলডন খেতাব ছাড়া আরও তিনটে মেজর খেতাব জিতেছিলেন। ১৯৩৯ এ এমেচার আর ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ এ প্রফেশনাল র‍্যাঙ্কিং এ শীর্ষস্থানে ছিলেন। কিন্তু এখন লাইমলাইটে আসতে চাইছেন। আর এই *Battle of the Sexes* এর পরেই তিনি *Sports Illustrated* আর *Time* এই দুটি ম্যাগাজিনেরই কভার পেজে স্থান পেয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, ২০১৭ সালে এনার কাহিনী নিয়ে এই নামে হলিউড সিনেমাও হয়ে গেলো।

এর মাত্র চার মাস পরেই ১৯৭৩ সালেই ২০শে সেপ্টেম্বর বিলি জিন কিং ববি রিগসের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি হয়ে গেলেন, এবার বিজয়ীর প্রাইজমানি এক লাখ ডলার। জিন কিং তখন *ATP* র‍্যাঙ্কিং এ এক নম্বরে। আমাদের আইপিএলের মতন সেদিনেও ছিলো চূড়ান্ত "গ্যালারী শো"।

জিন কিং কোর্টে এলেন ক্লিয়োপেট্রার বেশে, চারজন মাসলম্যান লোকের কাঁধে পাল্কিতে চড়ে, পিছনে সুদৃশ্য রিক্সায় ববি রিগস। রিগসের গায়ে পঞ্চাশ হাজার ডলারের সুগার ড্যাডি জ্যাকেট। সুতরাং টেনিসেও নন-টেনিস বিনোদন ঢুকে গেলো।

এরপর আরও ডজনখানেক *Battle of the Sexes* হয়েছিলো, কিন্তু দর্শকের আগ্রহটাই কমে গেলো।

১৯৯২ সালে আবার সাড়া জাগানো একটি *Battle of the Sexes*, এবার জিমি কোনার্স, তখন বয়স ৪০, বনাম মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, বয়স তখন ৩৮।

খেলার ফলাফল নিয়ে বিশেষ কিছুই বলার নেই, কারণ এগুলো টেনিস সার্কিট ধর্তব্যের মধ্যাই আনে না। শুধুই কয়েক ঘন্টার বিনোদন। এখানে মহিলা প্রতিযোগীদের টাইটেল দেওয়া হয় "*The Battle of Champions*" পুরোটাই প্রাইজমানি আর উদ্যোক্তাদের বানিজ্য। নইলে রিটায়ারমেন্টের দশ বছর পরে জিমি কোনার্স আর মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা এইরকম খেলায় রাজি হবেন?

নতুন বছর এলে

Amit Mukherjee | 1982 MET

যেসব পাঞ্জাবিগুলো রঙচটা মনে করে
তুলে রাখা আছে
এবার দেখেশুনে গায়েতে চড়াবো।
বসন্ত প্রবীণ বলে হয়তো মানাবে।

যেসব চিনাবাদাম খোসা না ছাড়িয়ে
আজও ঠোঙাতে বন্দী
তাদেরও রোদে এনে ভাঙা যেতে পারে
টুকরো মিয়োনো স্বাদ অন্যরকম।

যেসব তরুণীকে লেখা হলুদ পোস্টকার্ড
ডাকবাক্সে ফেলাই হলো না কোনোদিন
তার কিছু আজ ডাকে যেতেই তো পারে।
বিকেল গড়ালো বলে অবজ্ঞাই পাবে?

নতুন বছর এলে
নতুন আলোর খোঁজ নতুন হাওয়ায়।
তা' বলে কি পুরোনো সব ফেলে দিতে হবে?

সব কি আর ফেলে আসা যায়!

হাত ধরবে

Amit Chakroborty | 1982 CE

ট্রলি ব্যাগের সুবিধা যেমন অনেক, অসুবিধাও কম নয়। যাত্রা পথে, বিশেষ করে বিমান যাত্রায় ট্রলি ব্যাগ কে উপেক্ষা করা খুব মুশকিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জীব জগতের বিবর্তন হয় তেমন আমাদের ব্যবহৃত জিনিসেরও একটা বিবর্তনের ধারা চলতে থাকে।

ট্রলি ব্যাগের জন্ম কোথায় এবং কবে জানি না তবে আমার সঙ্গে এর পরিচয় বোধকরি ত্রিশ বছর আগে হয়েছিল। আগে এই ধরনের সাধারণ ব্যাগের একটা ধারে ছোট ছোট চারটে পায়া থাকতো যার ওপর ভর করে ব্যাগ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো মাটিকে স্পর্শ না করে। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে চলতে গেলে হাতে ঝোলাতেই হতো, তাতে ব্যাগের পুরো ভারটা হাতে চলে আসতো। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর হাত টন টন করতো। কিন্তু কোনো উপায় নেই। ব্যাগটি নামিয়ে রাখলে এগোনো যাবে না আর এগোতে গেলে ব্যাগটিকে নামিয়ে রাখা যাবে না। অগত্যা টন টন ব্যথা নিয়ে চলো যথক্ষণ পর্যন্ত না গন্তব্য স্থান আসে অথবা হাতের বোঝা কারুর মাথায় ওঠে অর্থাৎ কুলির শরণাপন্ন না হওয়া যায়।

অবশেষে মানুষের বুদ্ধিতে পেছনের দুটো পায়ের জায়গায় দুটো ছোট ছোট চাকা লাগিয়ে দেওয়া হলো। টেলিস্কোপের মতন টেনে হাতল ধরে গর গর করে এগিয়ে চলো। কোনো সন্দেহ নেই এতে শুধু যে মানুষের স্পীড বাড়লো তা নয় হাতের ব্যথাও আর রইলো না। সেই ট্রলি ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে যাবার একটা কায়দা আছে। ব্যাগটা টানার সময় হেলে থাকবে দুটো চাকাকে ভর করে। ব্যাস, এবার হাতল ধরে টানলেই এগোবে। এতে সুবিধে হলো অর্ধেকটা ভার হাতে আর অর্ধেকটা মাটিতে অর্থাৎ ধরিত্রীতে। এই সময়, একদিন ধরিত্রী মানুষকে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাগে তো তোমার বোঝা, এগোতে গেলে তোমার বোঝা তুমিই বইবে সেটাই স্বাভাবিক; তাহলে খামোকা আমায়

আবার অর্ধেক বোঝা দিচ্ছ কেন? মানুষ উত্তর দিলো, দেখো আমি বোঝা নিলেও আসলে তুমিই তো আমার বোঝা বইবে, তুমিতো আমার মা, তোমাকে ভর করেই তো আমি উঠে দাড়িয়েছি। এখন ধরিত্রী মা তুমি, "না" বললে চলবে কি করে ? মা সন্তানের কাছে হার মানলো, বললো এগিয়ে যাও, তবে সাবধানে।

আরো জোরে এগোতে হবে, তাই এই অর্ধেক বোঝাটাও অনেক। এবার এলো চার চাকা। সিঙ্গেল চাকা থেকে ডবল চাকা, সঙ্গে বল বিয়ারিং। এর মানে শুধু এক দিকেই চলা নয়, যেদিকে খুশি সেদিকে, এক মোচড়ে দিক পরিবর্তন, বাম থেকে ডাইনে, সামনে থেকে পেছনে। দ্রুত এবং আরও সহজে।

অভ্যাস মানুষের দাস নয়, মানুষ অভ্যাসের দাস। স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে। এবার চার দিনের টুর তাই লাগেজ একটু বেশিই ছিল। যাত্রার আগে ব্যাগ গোছাতে হবে। ট্রলি ব্যাগ খুঁজে চলেছি বাড়ির আনাচে কানাচে, সর্বত্র। গত ত্রিশ বছর ধরে আপিসের কাজে অনেক যাতায়াত করার দৌলতে অনেক ব্যাগ কেনা হয়েছে, সেই সব ব্যাগ ছড়িয়ে আছে বাড়িরই আনাচে কানাচে তবে কেউই সুস্থ নেই। একটার চাকা নেই, একটার হাতল ভাঙ্গা, আর সব ঠিক থাকলে টেলিস্কোপ কায়দার হাতল কাজ করে না।

গত টুর-এ আমার সবেধন নীলমণি ট্রলি ব্যাগটাকে নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম। টুরের মাঝপথে হটাৎ ব্যাগটা বিগড়ে যায়। টেলিস্কোপ হাতল কিছুতেই আর সংকুচিত হচ্ছিল না। প্লেনের আইলে দাঁড়িয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছি হাতলটাকে ব্যাগের পেটে ঢোকানোর জন্য কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল। ততক্ষণে আমার পেছনে আমার সহ যাত্রীদের লম্বা লাইন; আইল আটকে থাকায় কেউ এগোতে পারছে না। সবাই চুপটি করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। অনেক সময় অন্যের মৌনতাও ভীষণ ভারী হয়ে দাঁড়ায়। তাই কান লাল হয়ে গেছে বুঝতে পারছি, তার তাপ টের পাচ্ছিলাম রীতিমতো। হার্ট বিট বেড়েছে, প্রেসার বেড়েছিল কিনা কে জানে, আমি তো আবার হাইপারটেনশন-এর রুগী! অবশেষে অপরাধীর মতো, ভাঁজ না করেই লম্বা হাতল সমেত ব্যাগটা ওভার হেড কেবিনে রাখলাম অনেকের ব্যাগ রাখার জায়গা দখল করে। তাই সেইরকম লজ্জার পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যাতে আর না হয় তাই একটা ভালো ট্রলি ব্যাগ সন্ধান পর্ব চালিয়েছিলাম অনেকক্ষণ পুরো বাড়িটা চষে ফেলে, কিন্তু রিপোর্ট -- নেগেটিভ। অগত্যা একটা মাঝারি সাইজের হাত ব্যাগে সব লাগেজ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম, কাজ শেষে চারদিন পরে বাড়ি ফিরছি।

কলকাতা-দিল্লী-লখনৌ-দিল্লী করে ব্যাগ টানতে টানতে আমি যখন ক্লান্ত তখন কলকাতা ফেরার পথে দিল্লী এয়ারপোর্টেই ঠিক করলাম একটা ট্রলি ব্যাগ কিনবো। চার চাকার ট্রলি ব্যাগ। তারপর হাত ব্যাগের বোঝা ট্রলি ব্যাগ এ ভরে দিয়ে একটা হাতকে বোঝা থেকে মুক্ত করবো। সেই মতো আন্দাজ করে একটা প্রমাণ সাইজের ট্রলি ব্যাগ পছন্দ করলাম।পছন্দ করতে অনেক সময় গেলো। পছন্দের জন্য টার্গেট লিস্টটি ছিল -- স্মার্ট হতে হবে, হালকা হতে হবে আবার ব্যাগের পেটের সাইজ এমন হতে হবে যেন আমার সব যাত্রাকেই সামাল দিতে পারে। অনেকটা বিয়ের জন্য পাত্রী দেখার মতো ব্যাপার! পাত্রীকে সুন্দরী হতে হবে আবার সর্বগুনসম্পন্নাও হতে হবে, পাত্র নিজে যতই অপদার্থ হোক না কেন।

ট্রলি ব্যাগ কেনা পর্ব শেষ করে, নতুন ট্রলি ব্যাগটিতে যেই বোঝা বদল করতে যাবো তখন আমার সহকর্মী আমাকে বললো সময় নেই, বোর্ডিং গেটের সামনে গিয়ে বদলের কাজটা করতে হবে। কথায় যুক্তি ছিল। মেনে নিয়ে - তিনটে ব্যাগ নিয়ে দৌড় লাগালাম। কাঁধে ল্যাপটপের ব্যাগ, এক হাতে সামগ্রী সমেত হাত ঝোলানো ব্যাগ, আর এক হাতে নতুন ট্রলি ব্যাগ। ব্যাগের বংশ বৃদ্ধি হলো। তিন ব্যাগ বাবাজীদের নিয়ে আমি হাঁসফাঁস করছি আর দৌড়াচ্ছি। আজকালকার এয়ারপোর্ট-ও হয়েছে সেরকম, যাচ্ছি তো যাচ্ছি। আমাদের গেট ৫১, একদম শেষ মাথায়। ডিপার্চার করিডোর তো নয় যেন একটা রানওয়ে, একটু জোরে দৌড়াতে পারলেই এস্কেপ ভেলোসিটি নিয়ে আকাশে... প্লেনের আর দরকার হবে না।

যখন আমরা নির্দিষ্ট গেট-এ পৌঁছলাম তখন আমি ক্লান্ত। মনে হচ্ছিল যেন সবে টি-এম-টি টেস্ট শেষ করলাম। এবার ব্যাগের বোঝা বদলের পালা -- হাত ব্যাগ থেকে ট্রলি ব্যাগ-এ। মেঝেতে প্রায় বসে কাজ শুরু হলো। কিন্তু একি! অর্ধেক জিনিষপত্র বদলানোর আগেই, নতুন প্রমাণ সাইজের ট্রলি ব্যাগ হাত তুলে দিয়েছে। শত চেষ্টা করেও কবজা করতে পারলাম না। কিছু সামগ্রী তখনও হাত ব্যাগে রয়ে গেছে। হাল ছেড়ে দিলাম। যে কাপড়ের হাত ব্যাগ কে পত্রপাঠ বিদায় করবো ভেবেছিলাম তাকে আমার এখন দরকার। পুরনো হাত ব্যাগকে ফেলতে পারলাম না, নিজের স্বার্থেই। বাড়ী ফিরছি তিন ব্যাগবাবাজীকে সঙ্গে নিয়েই।

জীবনের গোধূলি বেলায় একটা সামান্য কাপড়ের হাত ব্যাগের কাছ থেকে এরকম শিক্ষা নিতে হবে কখনো ভাবিনি। কাউকেই আন্ডার এস্টিমেট করতে নেই, কার ধারণ ক্ষমতা কতো, কতো তার গভীরতা সেটা বাইরেটা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। নতুন কে তো আপন করতেই হবে কিন্তু পুরোনোকেও বোধ হয় একেবারে ফেলে দেওয়া উচিত নয়, কখন যে সে এসে বিপদে হাত ধরবে কে জানে।

(লেখা -লখনৌ থেকে দিল্লী যাবার ফ্লাইট যাত্রায় ৮/৪/২০২২)

গল্পবাসা-ঘুষ

Mayukh Datta | 1990 CE

সমরেশবাবু পি ডব্লু ডি তে চাকরী করেন। মফঃস্বলে বড় হয়ে ওঠা মানুষ, পাড়ার বরাবরের 'ভাল ছেলে', মানে ঠিক যেরকম ছোটোবেলায় শেখানো হত - কখনো মিথ্যে কথা বলবে না,

সন্ধ্যে সাতটার পরে বাইরে থাকা ঠিক নয়, পাড়ার উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব

করার দরকার নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি... ইঞ্জিনীয়ারীং পাশ করে প্রথম জীবনে কয়েকবছর প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরী করে, বিভিন্ন সাইটে সাইটে ঘুরে উপলব্ধি করেছিলেন যে এত খাটাখাটনি ক রে পয়সা রোজগার করে পেটেরভাত যোগাড় করাটা ঠিক জমছে না যেন, জীবনের সব রং, রস থে কে

বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন, সময়ই পাচ্ছেন না নিজের হাজারটাশখ পূর্ণ করার!! শেষে, কলেজের বন্ধু সুমিতের কথায় সরকারী পরীক্ষা দিয়ে এই পি ডব্লু ডি র চাকরী। প্রথমে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, "ওখানে তো শুনেছি, ঢুকলেই সবাই কে ঘুষ নিতে হয়!!"

- কে বলল তোকে? তুই না নিতে চাইলে নিবি না.... আর তোকে আমি জানি, ঘুষ নিতে হলে কলজের কিছুটা জোরও থাকতে হয়, ওটাও একটা আর্ট, তোর সেই স্কিল নেই!!

" না, মানে, কেউ নিতে না চাইলে নাকি চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়..."

-

ওসব লোকের বানানো কথা, নিজেদের দুনম্বরীকে মান্যতা দিতে এসব রটায় সবাই... আমি জানি বেশ কিছু লোককে, যারা ঘুষ নেয় না... পৃথিবীটা এখনো পুরোটা নষ্ট হয়ে যায় নি রে...

বেশী চিন্তা করিস না, তোর মত ছেলের কাছে সাইটে সাইটে ঘুরে জীবন নষ্ট করতে না চাইলে এই সরকারী চাকরীর মত ভাল চাকরী আর হয় না...

এরপরে পরীক্ষা পাশ করে সরকারী কাজে যোগদান, এদিক ওদিক কিছু প্রেশার ছাড়া এখনো অবধি ঘুষের ধারে কাছে নেই সমরেশবাবু, এখন বীরভূম জিলা সদর অফিসে পোস্টিং!!

কাজের "সাহেব" হিসেবে অল্পদিনেই বেশ পরিচিতি হয়ে গেছে!! সহকর্মী, অফিসের পিওন, কন্ট্র্যাকটার সবার সাথে সুব্যবহার করেন, সবাইকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করতে উন্মুখ থাকেন নিজের ক্ষমতামত, কিন্তু নিয়মের বড্ড কড়া, সময়মত অফিসে আসেন, খুব দরকারী কাজ না থাকলে সময়মত কোয়ার্টারে ফিরে যান।পোস্টিং এর একমাসের মধ্যেই সম্মিলনী পাড়া থেকে স্টেশান চত্তরের

ন্যাড়াকালীতলা অবধি মোটামুটি সবাই কানাঘুষোয় জেনে গেল বাকি সব "সাহেব"এর মত উনি নাকি ঘুষ খান না। সিউড়ি একটা ছোট্ট শহর, তাই সবাই সবাই কে চেনে... ঠিক কবে থেকে এই প্রথা চালু হল বলা খুব মুশকিল, তবে পি ডব্লু ডি বা সেচ দপ্তরের যে কোনো কাজে ৫% থেকে ১০ % ঘুষ দিতে হবে, সেটা
সবাই জানে, এবং টেন্ডারের দামের সাথেই এই হিসেবটা ধরে নিতে হয়!!

সমরেশবাবুর দপ্তরে কন্ট্র্যাক্টারের মাসিক বিল পেমেন্ট করতে হলে ওনাকে নাকি কিছু দিতে হবে না - এসব নতুন নিয়মে আরো অনেক অধস্তনের সাথে বেজায় চিন্তায় পড়ে গেল দপ্তরের পুরোনো পিওন অজয়ও...। প্রতিটা বিলের ফাইল এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে নিয়ে যেতে ওর পকেটেও ১০০/২০০টাকা আসে... সরকারের টাকায় কি আর সংসার চলে আজকালকার এই ঊর্ধমুখী বাজারে? এমনিতে এই নতুন সাহেবকে অজয়ের বেশ পছন্দ, সারাক্ষন একটা মায়াময় হাসি লেগে থাকে মুখে, এই একমাসে কোনোদিন মাথা গরম করতে দেখেনি বীরভূমের এই কাঠাফাটা গরমের মধ্যেও... আপনি, আপনি বলে কথা বলেন সবার সাথে, একদিন তো অনেকক্ষন ধরে অজয়ের
পুরো পরিবারের খোঁজ নিলেন, ছেলে বড় হয়ে ইঞ্জিনীয়ার হতে চায় শুনে বেশ কিছু টিপস দিলেন, বললেন ".. একদিন আমার কাছে নিয়ে আসুন, আমি ওর সাথে কথা বলে দেখব কোন লাইনে ওর উৎসাহ আছে, সেই হিসেবে আগে থেকে তৈরী হওয়া
দরকার, নাহলে আজকের

যুগে ইঞ্জিনিয়ারীং কথাটা খুব জেনারেল একটা কথা... ওকে এখন থেকেই তৈরী করা দরকার..."

মূলত অজয়ের থেকেই ওনার ব্যাপারে বিভিন্ন খবর বা গল্প চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এই ছোট্ট শহরে। সব কিছুর মধ্যে
আবার, এই ঘুষ না খাওয়া সমরেশবাবুকে দিয়ে কিভাবে "কাজ উদ্ধার"

হবে -এসব চিন্তা করতে লাগল অনেকেই.....।

" আরে টাকা খায় না তো কি, দেখ মদ খায় কিনা, বা মেয়ে চায় কিনা, তাহলে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব.." কন্ট্র্যাক্টরস ফোরামেরঅফিসে সেদিন আলোচনা হচ্ছিল...

"ঠিকই, ব্যাটা নিশ্চই অনেক বড় খেলোয়াড়, হয়ত সবার চোখের আড়ালে সবকিছু করতে চায়, ৭ দিন, ৬ রাতের একটা পাটায়া ট্যুরের অফার দিয়ে দেখা যেতে পারে..."

কিন্তু, জানা গেল যে মদ, মেয়েমানুষ কোনো কিছুতেই নাকি ওনার নেশা নেই!! ঘোরতর সংসারী, ছাপোষা একটা মানুষ, পাসপোর্ট করার কথাই নাকি কোনোদিন চিন্তা করেন নি, পাটায়া তো দূরঅস্ত, জীবনে নাকি বাংলার বাইরেই কোনোদিন বেরোন নি, কি ঘরকুনো রে বাবা!!

এভাবেই আরো দুমাস কেটে গেল, এক কন্ট্র্যাকটারের বিল পাশ করে দেওয়ার পরে সেই কন্ট্র্যাকটার সিউড়ি বাজার থেকে নাকিপাঁচ কিলো আম কিনে একটা ঝুড়িতে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিল " স্যার, আপনি তো আর অন্যদের মত কিছু নেবেন না, তাই আমার বাগানের আমই আনলাম আপনার জন্য!!" সমরেশবাবু দুটো আম নেড়ে চেড়ে দেখে, একবার নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকে মুচকি হেসে নাকি বলেছিলেন "আমি যে আম খেতে ভালবাসি সেটা কি অজয় বলেছে
আপনাকে? তবে আলফান্সো আমের ফলন যে আজকাল বীরভূমের গ্রামেও হচ্ছে সেটা আমার জানা ছিল না!!" যাই হোক, এরপরে খুব ঝামেলা করে ঐ কন্ট্র্যাকটরের হাতে পাঁচশো টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন "দয়া করে আর আপনার বাগানের আম বা পুকুরের মাছ,

ইত্যাদি আনবেন না, ওই সব অর্গ্যানিক খাঁটি জিনিস কি আর আমাদের মত ভেজাল খেয়ে বড় হওয়া ছাপোষা
লোকেদের পেটে সয়?, আমাদের পেট খারাপ হয়ে যায়..." | দরজার পাশ থেকে সব শুনে
অজয় কিছুটা যেন লজ্জা পেয়েই সরে গেল....

একদিন সন্ধ্যেবেলা পি ডব্লু ডি ব্যাচেলার মেসে তাস খেলার আড্ডায় একদিন এক শুভানুধ্যায়ী বলেই বসল "... নিজে ঘুষ
নেবেন না, ঠিক আছে, কিন্তু সাপ্লাই চেইন টা ভাঙবেন না যেন.... তাহলে
কিন্তু অনেকেই রেগে যাবে, আপনার পেছনে পড়ে যাবে...." | শান্তিপ্রিয় সমরেশবাবু কি বুঝলেন
কে জানে, শুধু বললেন "আরে, আমি সরল সাদাসিধে মানুষ, আমি তো কারুর পেছনে লাগছি না,
আমি শুধু বলছি যে বিলে সাইন করতে আমাকে কোনো টাকা দিতে হবে না... বাকি যে যা নিচ্ছে

তাতে আমিকি কিছু বলছি?!!"

পাশ থেকে একটা ফচকে নতুন জয়েন করেই ফুলে ফেঁপে ওঠা অচিন্ত্য বলে উঠল ".. তা আজকের যুধিষ্ঠির দা, আপনি নিশ্চই
ছোটোবেলায় পড়েছিলেন যে ' অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে...'
ওই প্রবাদ টা...?"

- আমি খুব ভীতু মানুষ, ওসব আমার হবে না...

মনে মনে খুব বিরক্ত সমরেশবাবু ঠিক করলেন আর এই ব্যাচেলর মেসে তাস খেলতে আসবেন না ..
এই ক`মাসে আস্তে আস্তে অজয়ের কেমন যেন ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে এই নতুন সাহেব কে |
ক্লাশ টেনে পড়া ছেলেটাও ওরসাথে কথা বলে খুব খুশী, আজকাল ইঞ্জিনীয়ারীং এরও যে এত এত শাখা আছে ওর জানাই ছিল না, সব শুনে এখন ওর ইচ্ছে মেরিন ইঞ্জিনীয়ারীং পড়তে যাওয়ার,
সমরেশবাবু ইন্টারনেট ঘেঁটে অনেক কিছু ছেলেকে পাঠাচ্ছেন| মাঝে মাঝেই কিছু টাকা জোর করে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন ছেলেকে ভাল করে পুষ্টিকর খাওয়ার খাওয়াতে!! তাই ফাইল চালাচালি বাবদ উপরি পাওনা কিছু কমে গেলেও অজয় আজকাল খুশীই থাকে নতুন সাহেব আসার পরে...সম্পর্ক টা এখন অনেক সহজ, বয়সে বড় বলে স্যার অজয়কে সম্মানও করেন, সম্পর্ক টা এখন সাহেব-পিওনের বাইরে বেরিয়ে অনেক সহজ, একদিন কথায় কথায় অজয় একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করেই বসল "স্যার, সবাই বলে আপনি কোনো ঘুষ নেন না, আপনি জীবনে সত্যিই কোনো দিন কোনো টাকা নেন নি?"

- আরে, এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ শোরগোল দেখতে পাচ্ছি, এটা নিয়ে এত হৈ হট্টোগোলের কি আছে? যেদিন ইঞ্জিনীয়ারীং পাশ করে চাকরীতে ঢুকি, আমার বাবা একটা কথা বলেছিলেন, আজও আমার কানে বাজে 'যদি কোনোদিন ঘুষ খাও, এটা নিশ্চিতকরে নিও যে পরের দিন থেকে সারা জীবন যেন আর চাকরী করতে না হয়'!! তাই যে কোনো ঘুষ নেওয়ার পরিস্থিতি এলেই আমি নিজেকে বলি ' এই টাকাটা নিয়ে আমি কি কাল থেকে চাকরী ছেড়ে রিটায়ার্ড জীবন কাটাতে পারব? আমার কি আর চাকরী করেখাওয়ার চিন্তা করতে হবে না? সেটা কোনোদিনই হয় না বলে প্রতিবারই আমি পিছিয়ে আসি...আসলে ঘুষ খেয়ে ধরা পড়লে যদি আমাকে জেলে পাঠায়, আর তারপরে আমাকে জেলের ওই খাবার খেতে হবে ভাবলেই পিছিয়ে আসি, অন্যদের মত আমার অত
স্কিলও নেই!!" বলে একটা কিরকম যেন সরল অসহায় হাসি হাসলেন সমরেশবাবু...

সমরেশবাবুর একটাই নেশা -
ফিল্টার উইলস সিগারেটের!! সিগারেটের অন্য ব্রান্ড মুখে তোলেন না, সেটা যদি রথম্যান্স বা ডানহিল বা ওইরকম দামী কোনো ব্রান্ডও হয়, তাহলেও...কথায় কথায়
বলেন " পুরুষ মানুষ তো!! একটা কিছু নেশা তো রাখতেই
হয়!!" কলেজ জীবনে বিড়ি খেতে হত
বাবার মেপে ঝুকে দেওয়া টাকা থেকে বাঁচিয়ে নিজের হাতখরচ যোগাড় করতে, বাধ্য হয়ে বিড়িই ভরসা... ফিল্টার উইলস তো দূরের কথা, অন্য কোনো কমদামী সিগারেট কেনারও পয়সা থাকত না, তাই চাকরী করেএকমাত্র ওই নেশাটাই ধরে রেখেছেন এবং ওই লালসাদা উইলস ফিল্টারের প্যাকেট টা দেখলেই মনটা কেমন যেন হূ হূ করেওঠে!! শান্ত, নির্বিবাদী দাম্পত্য জীবনে এই একটা ব্যাপারেই বৌ এর সাথে সমরেশবাবুর ঝামেলা লেগে থাকে প্রায় প্রতিনিয়ত...
বিয়ের এত বছর পরেও সিগারেটের গন্ধটা কিছুতেই যেন সহ্য হয় না ওনার বৌ এর.... কিন্তু হাজার ঝামেলা করেও এই বদভ্যাসটা কিছুতেই ছাড়াতে পারেন নি| মাসকয়েক পর থেকে অনেক কন্ট্রাক্টারই কিছুটা জেনে বুঝেই যেন ওনার অফিসে এসে কথাবার্তা বলার পরে আধা প্যাকেট বা একটা গোটা প্যাকেট ফিল্টার উইলস ওনার টেবিলে ফেলে রেখে যেতে লাগল!! সমরেশবাবু প্রথমদিকে সিগারেটের আসল মালিক কে খোঁজার খুব চেষ্টাও করতেন, তারপরে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, মানুষের 'ভালবাসার দান' হিসেবে রেখে দিতেন, মাঝে মাঝে অজয়কে ডেকে হয়ত পুরো প্যাকেট টাই দিয়ে দিতেন, বলতেন " যান, আজ রাতে খাওয়ার পরে মৌজ করে ফিল্টার উইলস খান, বিড়ি মুখে তুলবেন না, মুখে বাজে গন্ধ লেগে থাকে...বৌ নিশ্চই খুশী হবে..." |

এমনিতে স্বভাবশান্ত সমরেশবাবুর চেম্বার থেকে সেদিন হঠাত প্রচন্ড জোরে চীৎকার, তর্কাতর্কি শু নে অজয় ঘাবড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখল সমরেশবাবু আর শহরের প্রভাবশালী কন্ট্র্যাকটার বংশীর মধ্যে তুমুল ঝামেলা, কোনোভাবে ক্রুদ্ধ বংশীকে ঘরের বাইরে বের করতে করতে বেশী কিছু না বুঝলেও অজয় শুধু এটুকু বুঝল যে কোনো একটা নতুন কাজের বরাত কেন বংশীকে দেওয়া হল না, সেসব নিয়ে ঝামেলা.... অজয় এমনিতে মাঝে মাঝে সাহেবের কোয়ার্টারে এটা সে টা দেওয়া নেওয়া করতে যায়, সেই সুত্রে ম্যাডামের সাথেও দু একটা কথা হয়, মাঝে মাঝে আবার চা খেয়েও যেতে বলেন... সেদিন সাহেবের এই উগ্র রূপ দেখে একটু চিন্তিত হয়েই বিকেলে ম্যাডামকে গিয়ে বলল " স্যারের মনে হয় কাজের চাপ খুব বেড়ে গেছে, ওনাকে দুদিন ছুটি নিতে বলুন আপনি..." তারপরে অফিসের সব ঘটনা খুলে বলল...

এর দুদিন পরে, হঠাত একদিন অফিসের দেওয়ালে কাঁচা হাতের লেখায় একটা কার্টুন পোস্টার পড়ল -
এক চশমা পরা লোকএকহাতে একটা ফিল্টার উইলস সিগারেটের লালসাদা প্যাকেট, আর এক হা তে একটা জ্বলন্ত সিগারেট!! সাথে ক্যাপশানঃ

"সবাই জানে, আমি ঘুষ খাই না
আমি শুধু সিগারেট খাই...
বিশ্বাস করতে মন মানে না
আর কি কিছুই খাই না? হয়ত কেউ জানে না...."

অফিস যাওয়ার পথে ওই কার্টুন পোস্টার টা দেখে সমরেশবাবু এক ঘন্টা অফিসের দরজা বন্ধ করে বসে রইলেন, তারপরে অজয়কে ডেকে পাঠিয়ে খুব শান্ত ভাবে প্যান্টের পকেট থেকে একটা ফিল্টার উইলসের প্যাকেট আর লাইটার বের করে হাতে দিয়েবললেন " আজ থেকে আমার জীবনের একমাত্র নেশা - এই সিগারেট খাওয়াও ছেড়ে দিলাম সারা জীবনের মত, এটা শহরের সবাই কে একটু বলে দেবেন তো!!"

ব্যাপার স্যাপার দেখে অজয় আরো ঘাবড়ে গিয়ে সাহেবের কোয়ার্টারে গিয়ে ম্যাডামকে বলল "ম্যাডাম, স্যার কিসব বলছেন!!, কন্ট্র্যাক্টারের সাথে ঝামেলা করে সিগারেট খাওয়া নাকি ছেড়ে দেবেন...এক্কেবারে পাগল!! আপনি দেখুন একবার!!"
ম্যাডামের মুখে একটা হালকা রহস্যময় হাসি ভেসে উঠল, অজয় তার কিছুই বুঝতে পারল না...

On The Canvas

Bitan Chakraborty, son of Bidyut Chakrabarty | 1981 ME

Bitan Chakraborty, son of Bidyut Chakrabarty | 1981 ME

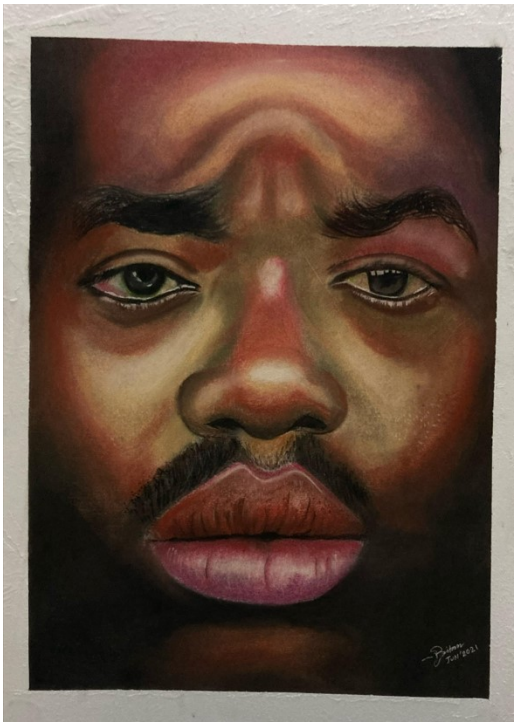

Bitan Chakraborty, son of Bidyut Chakrabarty | 1981 ME

Bitan Chakraborty, son of Bidyut Chakrabarty | 1981 ME

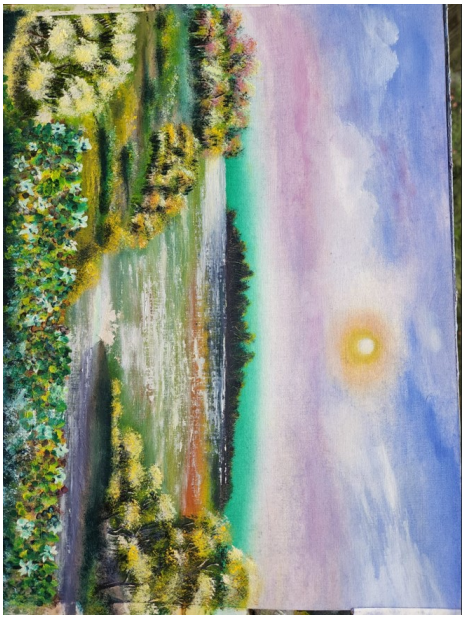

Manik Raha | 1984 ME

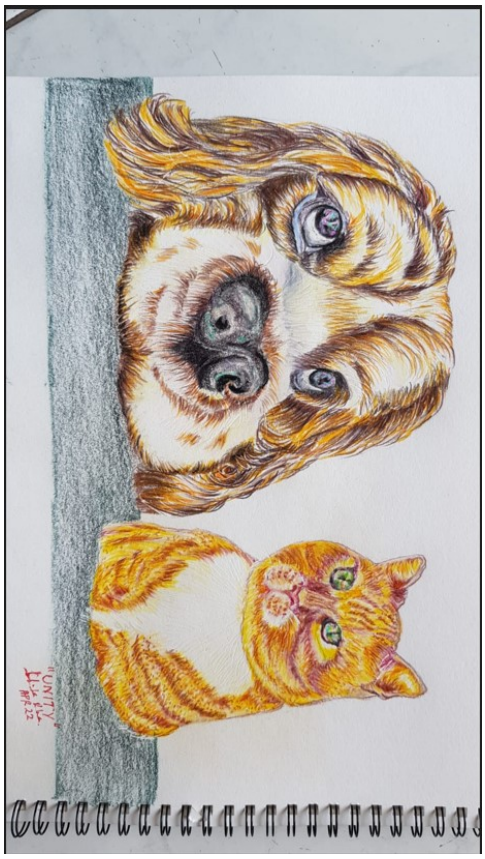

Manik Raha | 1984 ME

Bitan Chakraborty, son of Bidyut Chakrabarty | 1981 ME

Manik Raha | 1984 ME

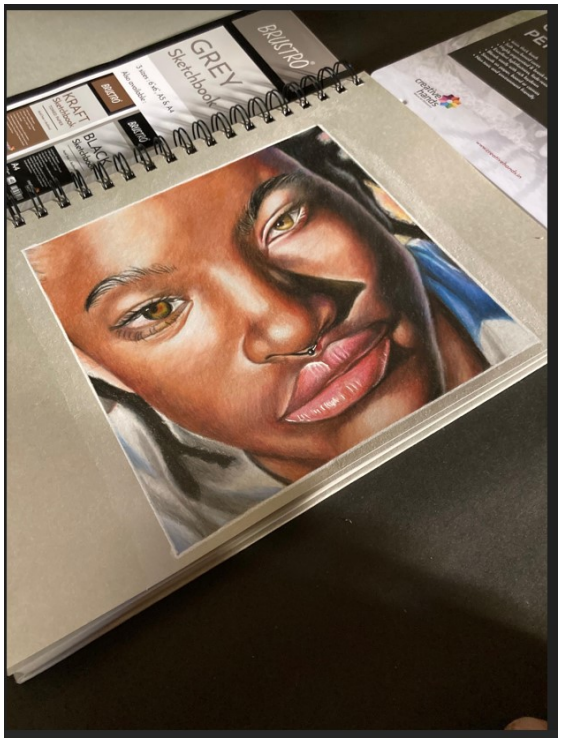

Bitan Chakraborty, son of Bidyut Chakrabarty | 1981 ME

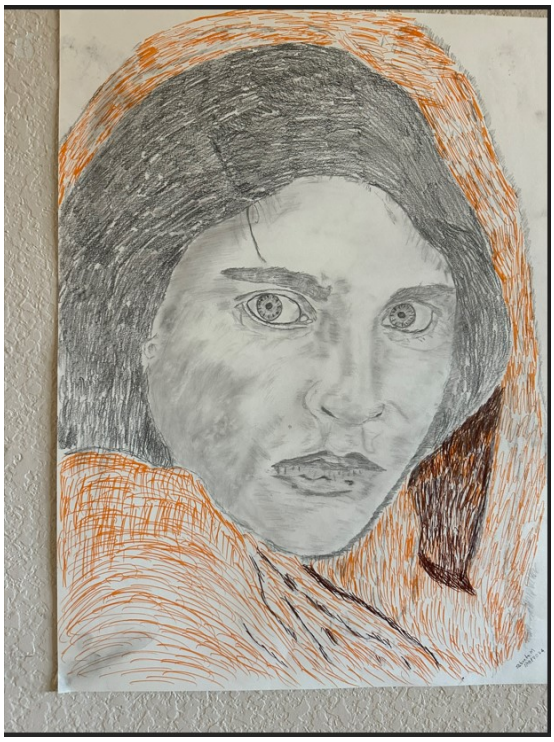

(Afghan Girl) **Subrata Mazumder | 1967 CE**

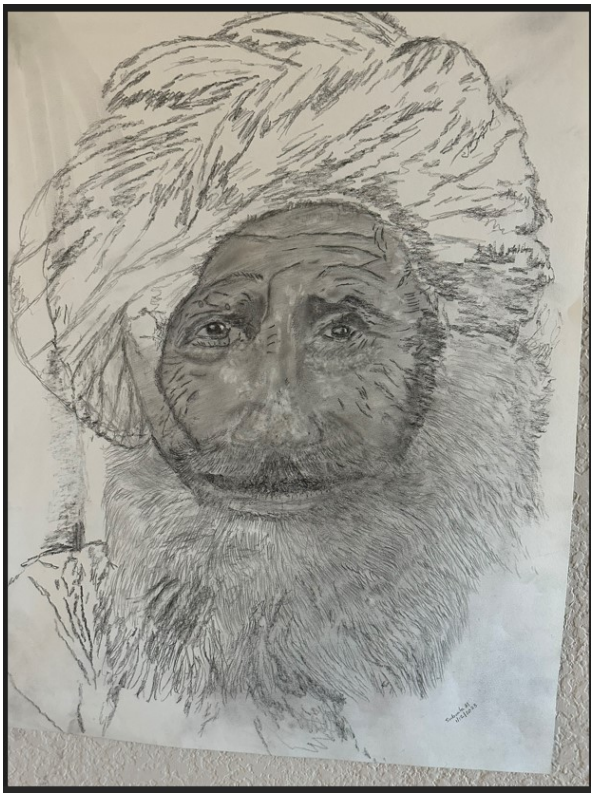

(Indian Farmer) Subrata Mazumder | 1967 CE

Shutter Bug

by Arghya Gupta

(Photograph of Princep Ghat) Arghya Gupta | 2011 ME

Class of 1998 Relive Their 25 Years

The Class of 1998 celebrated their 25 years at campus where 200 of their batchmates gathered for a day of fun and frolic. They also installed a Smart Conferencing Facility in the Training and Placement Gallery for the benefit of the students. Some of the professors from the yesteryears were invited to make it more nostalgic. The highlight of the celebration was the evening with the iconic band 'Chandrobindu'.

GAABESU

JOIN GAABESU & BECOME THE PERSON YOU WANT TO BE